পঞ্চাননের অশ্বমেধ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স লিমিটেড্
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

সরলকুমার আর গোরাকে

= পঞ্চাননের অশ্বমেধ =

পঞ্চাননের অশ্বমেধ ❊ ❊

ভালো আপদ হয়েছে ঘোড়াটাকে নিয়ে। পঞ্চানন কি যে করবে কিছুই স্থির করতে পারে না। কলিযুগ হয়ে অবধি আজকাল অশ্বমেধের রেওয়াজ নেই, তা নাহ'লে সে হয়ত একটা অশ্বমেধ যজ্ঞই করে বস্‌ত। কথা নেই, বার্ত্তা নেই, একটা কৃষ্ণের জীবকে ত অধর্ম্ম করে' অমনি মেরে ফেলা যায় না। তাই পঞ্চানন ভেবে রেখেছে সুবিধা পেলেই একবার ভট্টপল্লীর দিকে যাবে—মা কালীর কাছে অশ্ববলি দেওয়া যায় কিনা তার ব্যবস্থাটা জিজ্ঞাসা করবে।

সে মনে মনে আলোচনা করেছে, কেনই বা না দেওয়া যাবে? পাঁঠা যখন দেওয়া যায়—অশ্বতো পশুর মধ্যেই গণ্য? পাঁঠাও একটা পশু ছাড়া আর কি? পাঁঠারও চারটে পা, ঘোড়ারও,—সবদিকেই প্রায় মিল আছে, যা কিছু তফাৎ তা কেবল লেজের আর আওয়াজের। তা শাস্ত্রেই যখন রয়েছে

মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, তখন পাঁঠাভাবে ঘোড়াং দদ্যাতের বিধান কি আর শাস্ত্রে নেই ? নিশ্চয়ই আছে।

এক কালে অবশ্য ঘোড়াটা খুবই কাজ দিয়েছিল, কিন্তু বুড়ো হয়ে অবধি আজকাল কোনো কাজেই লাগা দূরে থাক, তার পেছনে লেগে থাকাই একটা কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বুড়ো বয়সে ভারি পেটুক হয়েছে ঘোড়াটা। জামার হাতা, খবরের কাগজ, ছেলেদের পুঁথিপত্র, দরকারী চিঠি, কখন কি খায় স্থির নেই। সেদিন ত কাশ্মিরী শালের আধখানাই প্রায় সাবাড় করেছে। তা ছাড়া রান্নাঘরের দিকেও বেশ নজর আছে।

এদিকে পঞ্চাননের সঙ্গে তার দস্তুর মত প্রতিযোগিতা। রান্নাঘর থেকে ছ্যাঁক্ ছোঁক্ আওয়াজ কিম্বা বেগুণ ভাজার গন্ধ এলে কার সাধ্য তাকে থামায় ? পাড়াগাঁয়ে মেটে বাড়ী পঞ্চাননদের—ধানের গোলাগুলো ঘুরে উঠোন পেরিয়ে গেলেই রান্নাঘর—মুহূর্ত্তের মধ্যে অশ্ববরকে সেখানে উপস্থিত দেখা যাবে। পঞ্চাননের গিন্নীর কি পরিত্রাণ আছে ওকে বেগুণ ভাজা না দিয়ে ? বেগুণ ভাজার প্রতি পঞ্চাননের দারুণ লোভ, অথচ এই ঘোড়াটার জন্যই সে পেটভরে বেগুণ ভাজা খেতে পায় না।

সেদিন পঞ্চানন-গিন্নী বেগুণ না ভেজে, বোধ হয় ঘোড়াটাকে ঠকাবার মৎলবেই, বেসন দিয়ে বেগুণী ভাজ্‌ছিলেন।

গন্ধ পাবামাত্র ঘোড়াটা সেইখানে হাজির! দু'একবার সে গিন্নীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে—চিঁহি চিঁহি!

সংস্কৃত ভাষায় যার মানে হচ্ছে—দেহি দেহি।

কিন্তু গিন্নী কর্ণপাত না করায় সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা সমস্ত বেগুণী আত্মসাৎ করে' পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে সুরু করে দিয়েছে। সেদিন থেকে ঘোড়াটার প্রতি আর পঞ্চাননের চিত্ত নেই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে ভাটাপাড়া সে যাবেই।

গিন্নীকে সে স্পষ্টই বলে দিয়েছে, ফের যদি তুমি ঘোড়াটাকে আস্কারা দাও, তাহলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন। সত্যি বল্‌ছি, একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে। ঘোড়াটা কিন্তু গ্রাহ্যও করে না পঞ্চাননকে।

তারপরের দিনই সে কলকাতা থেকে সদ্য আনানো পঞ্চাননের টর্চ্চ-বাতিটা মুখের মধ্যে পুরেছিল, কিন্তু ভালো করে' চিবিয়ে যখন বুঝল যে ওটা ঠিক বেগুণী নয় তখন বিরক্ত হয়ে ফেলে দিল।

টর্চ্চ লাইটটার অবস্থা দেখে পঞ্চানন ত অগ্নিশর্ম্মা। সে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার কান ধরে গালে এক চড় বসিয়ে দিল—হতভাগা, তোর কি একটুও বুদ্ধি নেই? তুই যে একটা গাধারও অধম হলি?

সে নাসিকার সাহায্যে গিন্নীকে ঠেলে ফেলে সেই ঝুড়িভরা বেগুনী খেতে সুরু করে দিয়েছে।

ঘোড়া মুখ সরিয়ে নিয়ে জবাব দিয়েছে—চিঁহিঁহি! অর্থাৎ---যা বলো তুমি!

পঞ্চানন যখন মাথা ঘামাচ্ছে, এই হঠকারিতার জন্য কি শাস্তি ওকে দেওয়া যায়, তখন ওর ছোট ছেলে বটকৃষ্ণ এসে পরামর্শ দিল,—বাবা, ওর লেজ কেটে দাও, তাহলে আর মশা তাড়াতে পারবে না।

পঞ্চানন ভেবে দেখ্‌ল, একথা বেশ। ওর শাস্তির ভারটা মশার উপরে ছেড়ে দেওয়াটা মন্দ না।

কিন্তু কাঁচি নিয়ে উদ্যোগ-আয়োজনের মুখেই ন-মেয়ে রাধারাণী বল্‌ল, বাবা করছ কি! মশার কামড়ে তাহ'লে ও আমাদের মশারীর মধ্যে এসে ঢুক্‌বে যে।

বাধ্য হয়ে পঞ্চানন কাঁচি থামিয়েছে, একটা ভাবনার কথা বই কি। ঘোড়াটার যে রকম বুদ্ধি-শুদ্ধির অভাব, তাতে সবই ওর পক্ষে সম্ভব। মশারীর মধ্যে ঢোকা কিছু কঠিন না ওর পক্ষে।

এমনই সমস্যার মুহূর্ত্তে জ্যোতিষ বোস এসে উপস্থিত।
---কিহে পঞ্চানন কি হচ্ছে?

—এই ভাই, ট্রেন্‌ করছি ঘোড়াকে।

—তুমি হর্স ট্রেনার হলে আবার কবে থেকে?

পঞ্চানন মাথা নেড়ে বলে—আর ভাই, শিক্ষা না দিলে

নিজের ছেলেই গাধা হয়ে যায়, তা ঘোড়া তো পরের ছেলে।

তা বেশ। কিন্তু তোমার দেনার কথাটা একেবারে ভুলে গেছ। আমাদের পাড়াই মাড়াও না দু'বছর থেকে—ব্যাপার কি ?

পঞ্চানন আকাশ থেকে পড়ল—কিসের দেনা !

—সেই যে একদিন বাজারে নিলে। বছর দুই আগে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, চার আনা পয়সা। পদ্মার ইলিশ এসেছিল হাটে, পয়সা কম পড়ল, তোমার কাছে নিলুম বটে। মনে ছিল না ভাই।

জ্যোতিষ বোস্ ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা পঞ্চানন জান্‌ত। কিন্তু বুড়োবয়সে সে যে এত বেশি হিসেবী হয়ে উঠ্‌বে, যে চার আনা পয়সার কথা দু'বছর ধরে মনে করে রেখে' ভিন্ গাঁ থেকে তিন মাইল হেঁটে চাইতে আস্‌বে, পঞ্চানন তা ধারণা করতে পারেনি। বাপ পাঁচশ টাকা রেখে গেছল, সুদে খাটিয়ে তেজারতি কারবারে সেই টাকা পঞ্চাশ হাজারে সে দাঁড় করিয়েছে—কিন্তু সামান্য চার আনার মায়া সে ছাড়তে পারেনি ভেবে পঞ্চানন আশ্চর্য্য হোলো।

—তা ভাই পঞ্চানন, প্রায় আড়াই বছর হোলো তোমার ধার নেওয়া। আমার খাতায় সমস্ত হিসাব লেখা আছে,

নিজে গিয়ে দেখ্‌তে পারো একদিন। এইবার একটু গা করে দিয়ে দাও।

—কি যে বলো তুমি? সামান্য চার আনা পয়সার জন্য আমি অস্বীকার করব? তা তুমি কষ্ট করে এত দূর এসে আমাকে লজ্জা দিলে। রাধু, তোর মা'র কাছ থেকে চার আনা নিয়ে আয় তো। আর বল্‌গে তোর জ্যোতিষ কাকার জন্যে বেগুণী ভাজ্‌তে। বেগুণী দিয়ে তেল মেখে মুড়ি খেতে বেশ হে! তার সঙ্গে কাঁচা-লঙ্কা—

জ্যোতিষ বোস বাধা দিয়ে বল্‌ল—তা হবে'খন! খাওয়া তো আর পালাচ্ছে না। কিন্তু একটা ভুল করছ তুমি, আড়াই বছর পরে পয়সাটা তো আর চার আনা নেই—

কিছু বুঝতে না পেরে পঞ্চানন বল্‌ল—চার আনা নেই কি রকম?

—আহা, বুঝতে পারছ না! স্নদে আসলে তা পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে দাঁড়িয়েছে। পৌনে তিন পাই দেওয়া একটু শক্ত হবে তোমার পক্ষে, তা তুমি পাঁচ টাকা এগারো আনাই দাও আমায়।

য়্যাঁ?—পঞ্চাননের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। পাঁচ টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাই! পৌনে তিন পাই দেওয়া তার পক্ষে শক্ত নিশ্চয়ই—কিন্তু পাঁচ টাকা এগারো

আনাটা দেওয়াই যে তার পক্ষে এমন কি সহজ তা সে ভেবে পেল না।

পঞ্চানন ভেবে কিনারা পায় না। হ্যাঁ, জ্যোতিষটা ছেলেবেলা থেকেই খুব হিসেবী, একথা তার অজানা নয়, কিন্তু তার হিসেবিতা যে বয়সের সঙ্গে এতটা মারাত্মক হয়ে উঠেছে তা কে জান্‌ত? নাঃ, জব্দ করতে হবে ওকে।

কাষ্ঠ হাসি হেসে পঞ্চানন জবাব দেয়—তা নেবেই না হয় পাঁচ টাকা এগারো আনা। তোমাকে দিলে তো জলে পড়বে না। বোসো, জিরোও, গল্প করো—অনেকদিন পরে দেখা।

—হ্যাঁ, বস্‌ব বই কি! বেগুনীও খাব! কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মুড়ি খেতে মন্দ না—কিন্তু কচি শশা আছে তো!

পঞ্চানন মনে মনে মৎলব এঁটে বলে—এতটা রোদে তিন কোশ দূর থেকে হেঁটে এসেছ, এই বয়সে এতটা পরিশ্রম করা কি ভালো তোমার পক্ষে? একটা ঘোড়া রাখো না কেন? ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হাঁটার পরিশ্রম হয় না, তাছাড়া রাইডিং একটা ভালো ব্যায়ামও। দেখ্‌ছ না, আমিও একটা ঘোড়া রেখেছি।

জ্যোতিষ পঞ্চাননের ঘোড়ার দিকে দৃক্‌পাত করে জবাব দেয়—বেশ ঘোড়াটি তোমার। দেখে লোভ হয়। আমিও অনেক দিন থেকে ভাব্‌ছি কথাটা। সত্যিই এ বয়সে আর

হাঁটা-চলা পোষায় না। কিন্তু মনের মত ঘোড়া পাই কোথায় ?

—কি রকম মনের মত শুনি ?

—এই ধরো খুব তেজী হবে না, আস্তে আস্তে হাঁট্‌বে। এই বুড়ো বয়সে যদি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই, তাহ'লে কি হাড়গোড় আর আস্ত থাক্‌বে ?

—তা সে রকম ঘোড়া কি আর পাওয়া যায় ? কিনে শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হয়। এই আমার ঘোড়াটা কি কম তেজী ছিল, অনেক কষ্টে ওকে শিক্ষিত করেছি। এখন যদি ওর পিঠে তুমি চাপো, তাহ'লে ও হাঁট্‌ছে বলে তোমার মনেই হবে না। এমন শান্ত, এমন বিনয়ী, এমন নম্র স্বভাব—মানে সুশিক্ষার যা কিছু সদ্‌গুণ, সব আছে এই ঘোড়ার !

—তা ভাই, তোমার এই ঘোড়াটির মত শিক্ষিত ঘোড়া পাই কোথায় ? আমি ত আর তোমার মত ট্রেনার নই। তা তোমার ঘোড়াটি কত দিয়ে কিনেছিলে ?

—দাঁওয়ে পেয়েছিলাম ভাই, মোটে পনের টাকায়।

—তা তুমি এক কাজ কর না, পঞ্চানন। পনেরো টাকা এগারো আনা পৌনে তিন পাইয়ে ঘোড়াটা আমাকে দাওনা কেন ? তোমার ত এগারো আনা পৌনে তিন পাই লাভ থাকল, তাছাড়া এতদিন চড়েও নিয়েছ। এই নাও দশ টাকার নোট্—

—না ভাই, ঘোড়াটা শিক্ষিত যে।

—আবার নতুন ঘোড়া সস্তায় কিনে শিখিয়ে নিতে পারবে—তোমার যখন ট্রেন করার ক্যাপাসিটি আছে! ছেলেবেলার বন্ধুর কাছে বেশি লাভ বা নাই করলে। এই নোট্‌খানা নাও, তোমার বাকি ধারও শোধ হয়ে গেল—তা নইলে ভেবে দেখ, পৌনে তিন পাই যোগাড় করা তোমার পক্ষে শক্ত হ'ত নাকি?

পঞ্চানন হাসি চেপে আম্‌তা আম্‌তা করে বলে—তা তুমি যখন এত করে বল্‌ছ। ছেলেবেলার বন্ধুর একটা কথা রাখলাম না হয়। বেশ, নাও তুমি ঘোড়াটা।

—ভালোই হোলো। ম্যাজিস্ট্রেট্‌ সাহেবের তাঁবু পড়েছে থানায়, যাচ্ছিলুম তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে। মনে করলুম পথে ত তোমার বাড়ী পড়বে, দেখা করে টাকাটা নিয়ে যাই। ভালোই করেছি। ম্যাজিস্ট্রেট্‌ সাহেবের কাছে হেঁটে গেলে কি ভালো দেখাতো?

জ্যোতিষ বোস ঘোড়ায় চেপে থানার দিকে রওনা হলেন। সত্যি, এমন শিক্ষিত ও শান্ত ঘোড়া প্রায় দেখা যায় না। পঞ্চানন যা বলেছিল, হাঁট্‌ছে বলে মনেই হয় না। অনেক তাড়াহুড়ো দিলে এক পা হাঁটে।

এদিকে পঞ্চাননও খুসী। নিঃশ্বাস ফেলে বলে—বাঁচা

গেল এতদিনে। আপদ বিদায়, সঙ্গে সঙ্গে নগদ টাকা লাভ! অশ্বমেধ করতে যাচ্ছিলুম, তা জ্যোতিষ বোসকে দেওয়াও যা, অশ্বমেধ করাও তা। পৌণে তিন পাই দেওয়া বেজায় শক্ত হোতো।

কেবল গিন্নী একটু দুঃখিত। তিনি মত প্রকাশ করেছেন—খেতে পেত না বেচারা, তাই ও রকম চোঁ-চোঁ করত! ঘোড়ায় দানা খায়, ছোলা খায়, কত কি খায়—সে সব ও কখনও চোখেও দেখেনি। টর্চ্চ খাবে, বেগুণী খেতে চাইবে তা ওর দোষ কি! কথায় বলে পেটের জ্বালা :—

পঞ্চানন বল্‌ল—তাহ'লে ঘোড়াটার ভাগ্য বল্‌তে হবে। জ্যোতিষরা বড়লোক—সুখে থাকবে ওদের বাড়ী। আমরা গরীব মানুষ; নিজেদেরই দানা পাই না, কোথায় পাব ঘোড়ার দানা!

হেঁটে গেলে যতক্ষণে থানায় পৌঁছানো যেত, তার তিন গুণ সময় লাগ্‌লো জ্যোতিষ বোসের ঘোড়ায় চেপে যেতে। কিন্তু জ্যোতিষ ভারি খুসী। এতখানি রাস্তা তিনি অশ্বারোহণে এসেচেন, কিন্তু একবারও পড়ে যান্‌নি, কেবল ওঠার আর নামার সময় যা একটু কষ্ট হয়েছে। ওঠার সময় তিনি টুলে দাঁড়িয়ে চেপেছিলেন। কিন্তু নামবার সময় তিনি অনেক চেষ্টা করলেন যাতে ঘোড়াটা হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ে আর তাঁর

পক্ষে নামাটা সহজ হয়, কিন্তু ঘোড়াটা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল, একটু কাৎ হোলো না পর্য্যন্ত। তাঁর আশা ছিল শিক্ষিত ঘোড়া তাঁর অনুরোধ রক্ষা করবে, কিন্তু ঘোড়াটা না বুঝ্‌লে তাঁর ইঙ্গিত, না কান দিল তাঁর সাধ্যসাধনায়। বাধ্য হয়ে তাঁকে অনেকটা প্রাণের মায়া ছেড়েই, লাফিয়ে নাম্‌তে হোলো, কিন্তু সুখের বিষয় তাঁর হাড়গোড় ভাঙেনি কিংবা তিনি একটুও জখম্ হন্ নি।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষ বোসের আগে থেকেই আলাপ ছিল। জ্যোতিষ সেলাম ঠুক্‌তেই তিনি "হ্যালো মিষ্টার্ বোস্" বলে' তাকে অভ্যর্থনা করে' ভেতরে নিয়ে গেলেন। ঘোড়াটাকে আস্তাবলে নিয়ে গিয়ে দানা দেবার হুকুম হোলো আর্দ্দালির ওপর।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও জ্যোতিষ বোস আলাপ করছেন এমন সময়ে আস্তাবল থেকে এক বিরাট আওয়াজ এল—চ্যাঁ হ্যাঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি ব্যাপার? ম্যাজিষ্ট্রেট্ এবং জ্যোতিষ দু'জনেই চম্‌কে উঠ্‌লেন। ঘোড়ার আওয়াজ বটে, কিন্তু এ রকম আওয়াজ তাঁরা জীবনে কখনও শোনেননি। এমন কি, যে ঘোড়া ডার্ব্বি জিতেছে, সেও এ রকম উচ্চধ্বনি করে না। দু'জনেই আস্তাবলের দিকে ছুট্‌লেন। সেখানে তখন অনেক লোক

জড়ো হয়েছে। আর ঘোড়াটা কেবল করছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

ঘোড়ার সামনে দু'বাল্‌তি ভরে ছোলা আর দানা সাজানো রয়েছে, কিন্তু ঘোড়াটা সব স্পর্শও করেনি। সে বোধ হয় তার এতখানি সৌভাগ্য বিশ্বাস করতে পারছে না। সে একবার করে বাল্‌তির দিকে তাকাচ্ছে আর তার ভেতর থেকে অট্টহাস্য ঠেলে উঠ্‌ছে—চ্যাঁ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ হ্যাঁঃ!

কি করে ওর অট্টহাস্য থামানো যাবে সবাই দারুণ ভাবনায় পড়ল। ঘোড়ার হাসি থামানো কি সহজ ব্যাপার? কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে হোলো না কাউকে।

হাস্‌তে হাস্‌তে ঘোড়াটা মারা গেল।

কাষ্ঠ-কাশির চিকিৎসা * *

বড়্দির আদুরে খোকাকে একটি কথা বলার কারু জো নেই। বলেছ কি, খোকা তো বাড়ী মাথায় করেছেই, বড়্দি আবার পাড়া মাথায় করেন! প্রতিবেশিদের প্রতি বেশী রাগ আমার নেই—তাই যতদূর সম্ভব বিবেচনা করে' বড়্দি আর খোকাকে না ঘাঁটিয়েই আমি চলি।

কালই মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে পছন্দ করে' কিনে এনেছি, আজ সকালেই দেখি খোকা সেই দামী পাইনের ছড়িটা হস্তগত করে' অম্লান বদনে চর্ব্বণ করছে। খোকার এইভাবে ছড়িটা আত্মসাৎ করবার প্রয়াস আমার একেবারেই ভালো লাগল না, ইচ্ছা হোলো ওকে বুঝিয়ে দিই ছড়ির আস্বাদ মুখে নয়, পিঠে। কিন্তু ভয়ানক ভাবে আত্মসম্বরণ করে ফেললাম।

ভয়ে ভয়ে বড়্দির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম—"দেখ্‌ছ খোকা কি করছে?"

সঙ্গে সঙ্গে বড়্‌দির খাণ্ডামার্কা জবাব—"কি তোমার পাকা খানে মই দিচ্ছে ? ও তো ছড়ি চিবুচ্চে।"

আমি আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লুম, "তা চিবুক ক্ষতি নেই, কিন্তু যত রকমের কাঠ আছে, তার মধ্যে পাইন কাঠ খাদ্য হিসেবে সব চেয়ে কম পুষ্টিকর, তা জানো কি ? তা ছাড়া এখন চারধারে যে রকম হুপিংকাফ হচ্ছে—"

বড়্‌দি ঝাম্‌টা দিয়ে উঠলেন—"যাও যাও, তোমাকে আর বোকা বুঝোতে হবে না। সেদিন আমি একটা ওষুধের বিজ্ঞাপনে পড়লাম পাইন গাছের হাওয়ায় যক্ষ্মাকাশি পর্য্যন্ত সারে—যার হাওয়ায় যক্ষ্মা সেরে যায় তাতেই কি না হুপিংকাশি হবে ? পাগল !"

আমার মনে বৈরাগ্যের উদয় হোলো, বল্‌লাম, "বেশ, আমার কথার চেয়ে বিজ্ঞাপনেই যখন তোমার বেশী বিশ্বাস তখন আজই আমি এক ডজন ছড়ির অর্ডার দিচ্ছি, তুমি রোজ একটা করে' খোকাকে খাওয়াও। আহার ওষুধ দুই হবে।" বলে' বিনা-ছড়ি হাতেই বেরিয়ে পড়লাম।

জীবনটা বিড়ম্বনা বোধ হতে লাগল। সমস্ত দিন আর বাড়ী ফিরলাম না। ওয়াই, এম্, সি, এ-তে সকালের লাঞ্চ্ সারলাম, তারপর সোজা কলেজে গেলাম, সেখান থেকে এক বন্ধুর বাড়ী বিকেলের জলযোগপর্ব্ব সেরে চলে গেলাম খেলার

মাঠে। মহমেডান্ স্পোর্টিং জেতায় যে স্ফূর্তিটা হোলো, ক্লাবে গিয়ে ঘণ্টা দুই ব্রিজ-খেলায় হেরে গিয়ে সেটা নষ্ট করলাম। সেখান থেকে গেলাম সিনেমায় সাড়ে নটার শোয়ে।

রাত বারোটায় বাড়ী ফিরে সদর দরজা খোলাই পেলুম। ডাকাহাঁকি করতে হোলো না, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। জ্যাঠা-মশাই ভারী বদ্‌রাগী মানুষ, তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হলে আর রক্ষা নেই। পা-টিপে টিপে নিজের ঘরের অভিমুখে যাচ্ছি, বড়্‌দি কোথায় ওৎ পেতে ছিলেন জানি না, অকস্মাৎ এসে আক্রমণ করলেন।

"সুহৃৎ, খোকা বুঝি আর বাঁচে না।"

বড়্‌দির অতর্কিত আক্রমণ, তার পরেই এই দারুণ দুঃসংবাদ —আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লাম। "কেন, কেন, কি হয়েছে? ছড়িটা গিলে ফেলেছে না কি?"

বিপদের মুহূর্তে সবচেয়ে প্রিয় জিনিসের কথাই আগে মনে পড়ে। ছড়িটার দুর্ঘটনা আশঙ্কা করলাম।

"—না না, ছড়ির কিছু হয় নি।"

স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে বড়্‌দির দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। "যাক্, ছড়ির কোনো অঙ্গহানি হয় নি তো! বাঁচা গেছে।"

"না, ছড়ির কিছু হয় নি, তবে সন্ধ্যে থেকে খোকা ভারি

কাশছে—ভয়ানক কাশছে। হুপিংকাফ হয়েছে ওর—নিশ্চয়ই হুপিংকাফ। কি হবে সুহৃৎ।"

এতক্ষণে মুরুব্বি চাল্ দেবার সুযোগ এসেছে আমার। গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লাম—"তখনই তো বলেছিলাম সকালে। তা তুমি গ্রাহ্যই করলে না। তখন পাইনের হাওয়ায় কত কি উপকারিতার কথা আমায় শুনিয়ে দিলে! এখন ঠেলা সাম্লাও।"

"না সুহৃৎ, তোমাকে একবার ডাক্তার-বাড়ী যেতে হবে এখুনি।"

"এত রাত্রে? অসম্ভব,—ডাক্তার কি আর জেগে আছে এখনো? তার চেয়ে এক কাজ কর না বড়্দি?"

ব্যগ্রভাবে বড়্দি প্রশ্ন করলেন—"কি, কি?"

"পাইনের হাওয়ায় যক্ষ্মা সারে আর হুপিং সারবে না? ছড়িটা দিয়ে খোকাকে হাওয়া কর না কেন?"

বড়্দি রোষ-কষায়িত নেত্রে আমার দিকে দৃক্পাত করলেন—"না তোমাকে যেতেই হবে ডাক্তারের কাছে। নইলে জ্যাঠামশাইকে জাগিয়ে দেব। এই ডাক্ ছাড়লাম—ছাড়ি?"

"না না, রক্ষে কর—দোহাই। যাচ্ছি ডাক্তারের কাছে।"

খোকার অবস্থা পর্য্যাবেক্ষণ করলাম। হ্যাঁ—হুপিংকাফ, নিশ্চয়ই তাই—ছড়ি খেলে হুপিংকাফ হবে, জানা কথা। কি

কাশিটাই না কাশছে—নিজের নাক-ডাকার আওয়াজে শুনতে পাচ্ছেন না তাই, নইলে এই কাশির ধ্বনি কানে গেলে জ্যাঠামশাই ক্ষেপে যেতেন।

গেলাম ডাক্তারের কাছে—ভাগ্যক্রমে দেখাও হোলো। কাল সকালে তিনি খোকাকে দেখ্‌তে আস্‌বেন—এখন এক বোতল পেটেণ্ট হুপিংকাফ্‌-কিওর দিলেন, ব্যবস্থাও বাৎলে দিলেন। বড়্‌দিকে বল্লাম—“এই ওষুধটা এক এক চামচ তিন ঘণ্টা বাদ বাদ খাওয়াতে হবে।”

“তিন ঘণ্টা বাদ বাদ ? ওতে কি হয় ?—অসুখটা কতখানি বেড়েছে দেখ্‌চ না ? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ালে যদি বাঁচে খোকা ?”

“বেশ তাই খাওয়াও। আমি এখন ঘুমুতে চল্লাম।”

ঘণ্টাখানেক চোখ বুজেছি কিনা সন্দেহ, বড়্‌দির ধাক্কায় জেগে উঠলাম।—“আঃ, কি ঘুমুচ্চিস্‌ মোষের মত ? এদিকে খোকার যে নাড়ি ছাড়ে।”

ধড়মড়িয়ে উঠ্‌লাম—“তাই নাকি ?” যতটুকু নাড়ি জ্ঞান তাই ফলিয়েই বুঝলাম নাড়ি বেশ টন্‌ টন্‌ করছে। বড়্‌দিকে সে কথা জানাতেই তিনি আগুন হয়ে উঠ্‌লেন, জ্যাঠামশায়ের ভয়ে চ্যাচাতে পারলেন না এই যা রক্ষা। জিজ্ঞাসা করলাম—“ওষুধ খাইয়েছ ?”

"হ্যাঁ—দু' চামচ।"

"এক ঘণ্টায় দু' চামচ? বেশ করেছ।"

"সুহৃৎ, খোকার বুকে সেই পুল্‌টিশ্‌টা দিলে কেমন হয়? য়্যান্টিফ্লুজিষ্টিন্—যেটা জ্যাঠামশায়ের নিউমোনিয়ার সময় দেওয়া হয়েছিল—এখনো তো এক কৌটো রয়েছে। দেব সেটা?"

আমি বল্লাম, "ডাক্তার তো পুল্‌টিশ্‌ দিতে বলে নি!"

বড়্‌দি বল্লেন—"ডাক্তার তো সব জানে। সেটা দিয়ে কিন্তু জ্যাঠামশায়ের খুব উপকার হয়েছিল, আমি নিজে দেখেছি। তুই ষ্টোভ্‌ জ্বাল্‌ আমি ফ্লানেল্‌ যোগাড় করি।"

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে বড়্‌দি অনুচ্চ চীৎকারের একটা নমুনার দ্বারা জানিয়ে দিলেন, ষ্টোভ্‌ না ধরালেই তিনি অকৃত্রিম আর্ত্তনাদে জ্যাঠামশায়ের নিদ্রাভঙ্গ ঘটাবেন। আমি ভারি সমস্যার মধ্যে পড়লাম—যদি বা খোকা বাঁচ্‌ত, বড়্‌দির চিকিৎসার ঠেলায় সকাল পর্য্যন্ত—মানে ডাক্তার আসা পর্য্যন্ত—টেকে কিনা সন্দেহ। অথচ বড়্‌দির চিকিৎসায় সহায়তা না করলে আরেক বিপদ! এদিকে খোকার মৃত্যু, ওদিকে আমার অপঘাত—আমি ষ্টোভ্‌ ধরাতেই স্বীকৃত হলাম।

পুল্‌টিশের হাত থেকে খোকার পরিত্রাণের একটা ফন্দী মাথায় এল। ষ্টোভ্‌ ধরাতে গিয়ে বলে উঠ্‌লাম—"এই যা,

ধরচে না ত ! যা ময়লা জমেছে বার্ণারে। পোকার্‌টা দাও তো বড়্‌দি !”

“সর্ব্বনাশ ! পোকার্—সে যে জ্যাঠামশায়ের ঘরে !”

আমি তা জান্‌তাম।—“তাহ’লে কি হবে ? যাও তুমি নিয়ে এসো গে। নইলে তো ষ্টোভ্ ধরবে না।”

“বাবা ! জ্যাঠামশায়ের ঘরে আমি যাব না। তার চেয়ে আমি চ্যাঁচাব।”

“না—না, তোমায় চ্যাঁচাতে হবে না। আমি যাচ্ছি।”

“ওই সঙ্গে, তাক্ থেকে থার্ম্মোমিটারটাও এনো। জ্বর দেখ্‌তে হবে।”

খোকার গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম, বেশ গরম। পোকার্ আনি আর না আনি, থার্ম্মোমিটারটা দেখা দরকার। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে জ্যাঠামশায়ের কক্ষে ঢুকলাম, দরজা আব্‌জানই ছিল। অন্ধকার ঘরের মধ্যে জীবন্ত একমাত্র নাসিকা—নাসিকার কাজে ব্যাঘাত না ঘটিয়েই যদি থার্ম্মোমিটার বাগিয়ে নিতে পারি তাহ’লেই আজ রাত্রের ফাঁড়া কাট্‌ল।

কাছাকাছি একবেড়াল শুয়েছিল, অন্ধকারে দেখা তো যায় না, পড়বি ত পড়্ তার ঘাড়েই দিয়েছি এক পা ! সঙ্গে সঙ্গে হতভাগা চেঁচিয়ে উঠেছে—ম্যাঁও !

শুনেছি বেড়ালের দৃষ্টি অন্ধকারেই ভালো চলে, ওরই আগে

থেকে আমাকে দেখা উচিত ছিল। আমার পথ থেকে অনায়াসেই সরে যেতে পারত। নিজে দোষ করে নিজেই আবার তার প্রতিবাদ—আমার এমন রাগ হোলো বেড়ালটার ওপর, দিলাম ওকে কসে' এক শূট্, মহামেডান স্পোর্টিংএর সামাদের মতন।

আমার শূটটা গিয়ে লাগ্‌ল একটা চেয়ারে, সেখানেই যে এটা দাঁড়িয়েছিল জান্‌তাম না। পাজি বেড়ালটা এবার ঠিক নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। শূটের প্রতিক্রিয়া থেকে কোনো রকমে আমি টাল্ সাম্‌লে নিলাম, কিন্তু চেয়ারটা চিৎপাৎ হোলো।

এই সব গোলমালে নাসিকা গর্জ্জন গেল থেমে, কিন্তু আমার হৃৎকম্প আরম্ভ হোলো সেই সঙ্গে। ভাব্‌লাম, নাঃ, হামাগুড়ি দিয়ে চার-পেয়ের মত চলি, তাতে ধাক্কাধুক্কি লাগ্‌বার ভয় কম, সাবধানেও চলা যাবে, জ্যাঠামশায়ের নিদ্রা এবং নাসিকা গর্জ্জনের হানি না ঘটিয়ে নিঃশব্দে থার্ম্মোমিটারটা নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। একটু পরেই আবার নাক ডাক্‌তে লাগ্‌ল—আমিও নিশ্চিন্ত হ'য়ে হামাগুড়ি প্র্যাক্‌টিশ্ সুরু করলাম।

প্রথমেই একটা বস্তুর সংঘর্ষে দারুণভাবে মাথা ঠুকে গেল—হাত দিয়ে অনুভব করলুম ওটা চেয়ার। সব জিনিসেরই

দুটো দিক আছে—সুবিধার দিক এবং অসুবিধার দিক ; অন্ধকারে হামাগুড়ি-অভিযানে পা সামলানো যায় বটে, কিন্তু মাথা বাঁচানো দায়। যাক্, গোল টেবিলটা এতক্ষণে পেয়েছি, এবার হয়েছে, ঘরের মধ্যখানে পৌঁছে গেছি—এখান থেকে সোজা উত্তরে গেলেই সেই তাক্—যেখানে থার্ম্মোমিটার আছে।

অনেকটা তো গুড়ি দেওয়া হোলো—কিন্তু তাক্ কই? ভালো করে' তাক্ করতে গিয়ে টেবিলটাকে পুনরাবিষ্কার করলাম—এবার মাথা দিয়ে—এবং দস্তুরমত ভড়কে গেলাম! একি, এখনো আমি ঘরের মধ্যিখানেই ঘুরছি? আহত মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ভাব্‌তে লাগলাম—কি করা যায়?

নূতন উদ্যমে আবার যাত্রা সুরু করলাম। এই ত টেবিল—এই একটা চেয়ার—এটা? এটা জ্যাঠামশায়ের পিক্‌দানি—ছিঃ! যাক্‌গে, হাতে সাবান্ দিলেই হবে—এই ত দেয়াল, এই আরেকখানা চেয়ার ; এই গেল গিয়ে সোফা—একি? ঘরে ত একটা সোফা ছিল বলেই জান্‌তুম, নাঃ এবার হতভম্ব হতে হোলো আমাকে। যে-ঘরে দিনে দশবার আস্‌ছি যাচ্ছি, তাতে এত লুকোনো সম্পত্তি ছিল জান্‌তুম না ত। আরেকটু এগিয়ে দেখ্‌তে হোলো—আরো কি অজ্ঞাত ঐশ্বর্য্য উদ্ধার হয়! এই যে দেখ্‌ছি আরেকখানা চেয়ার—ঘরে আজ এত চেয়ারের

আম্‌দানি হোলো কোত্থেকে! এই যে ফের আরেকটা পিক্‌দানি—ছিঃ, এ-হাতটাতেও আবার সাবান্‌ দিতে হোলো! ছ্যাঃ!

নাঃ, এবার এগুতে সত্যিই ভয় করছিল। ঘরে আজ যে রকম পিক্‌দানির ছড়াছড়ি তাতে আর বেশি পরিভ্রমণ নিরাপদ নয়। দরজাটা কোন্‌ দিকে? এবার বেরুতে পারলে বাঁচি—আর থার্ম্মোমিটারে কাজ নেই বাবা! উঠ্‌তে গিয়ে মাথায় লেগে গেল—এ কোন্‌খানে এলাম? টেবিলের তলায় বুঝি? টেবিলটা তো ছোট এবং গোল বলেই জান্‌তাম—এ যে যেখানে, যত ঘুরে ফিরেই, উঠ্‌তে যাই মাথায় লাগে। ঘরের ছাদ নোটিশ না দিয়ে হঠাৎ এত নীচে নেমে আসবে বলে তো মনে হয় না। তবে আমার দণ্ডায়মান হবার বাধা এই দীর্ঘপ্রস্থ বস্তুটি কি? এটাকে নিয়ে ঠেলে উঠ্‌ব, যাই থাক্‌ কপালে।

যেই চেষ্টা করা, অমনি সহসা জ্যাঠামশায়ের নাসিকাধ্বনি স্থগিত হোলো। ক্ষণপরেই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—চোর, চোর! ডাকাত! খুনে! ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

ও বাবা! আমি জ্যাঠামশায়ের তক্তপোষের তলায়—কী সর্ব্বনাশ! তাঁকে শুদ্ধ নিয়ে উঠবার চেষ্টায় ছিলাম! এখন ওঁকে অভয় দেওয়া দরকার, বোঝানো দরকার চোর নয়, ডাকাত নয়, ভূমিকম্প নয়—অন্য কিছু, নগণ্য কিছু! মিহি সুরে ডাক্‌লাম—মিঁয়াও!

ক্ষণপরেই জ্যাঠামশাই চেঁচিয়ে উঠলেন—চোর, চোর! ডাকাত! খুনে! ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!

জ্যাঠামশাই যে খুব ভরসা পেয়েছেন এমন বোধ হল না। এবার গলা ফুলিয়ে ডাক্‌তে হোলো—ম্যাঁ-া-া-ও!

বড়্‌দি হ্যারিকেন হাতে ঢুক্‌লেন। জ্যাঠামশাই ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে বল্‌লেন—"ছাখ্‌তো বিনি, আমার তক্তপোষের তলায় কি?"

বড়্‌দি আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করে' আশ্বাস দিলেন—"ও কিছু না, জ্যাঠামশাই, একটা ইঁদুর—আপনি ঘুমোন!"

জ্যাঠামশাই সন্দিগ্ধ স্বরে বল্‌লেন—"ইঁদুর আমার চৌকি ঠেলে তুল্‌বে? ইঁদুরের এত জোর—একি হতে পারে?"

বড়্‌দি বল্লেন—"ধাড়ী ইঁদুর যে!"

"ধাড়ী ইঁদুর! একটু আগে বেড়ালের ডাক শুন্‌লাম যেন। বেড়াল-ইঁদুর এক সঙ্গে,—ওরা যে খাদ্য-খাদক বলেই আমার জানা ছিল। যাক্‌গে, আলোটা নিয়ে যা সাম্‌নে থেকে—আমার ঘুম পাচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্যাঠামশায়ের নাসিকা-বাদ্য বেজে উঠ্‌ল। বড়্‌দির আড়াল দিয়ে আমিও বিপদ-সঙ্কুল কক্ষ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করলাম।

বাইরে এসে হাঁপ্‌ ছেড়ে দেখি আর ভোর হতে বাকি নেই—সুদূর আকাশে হীরকাভা দেখা দিয়েছে। রাত দুটো থেকে এই ভোর পাঁচটা, ওই ঘরে আমি কেবল ঘুরেছি—পায়ে মিটার্‌

বাঁধা ছিল না, নইলে জানা যেত কত মাইল মোট হোলো ! তিন ঘণ্টায় তিরিশ মাইল তো বটেই !

বড়্দি করুণ কণ্ঠে বল্লেন—"তুমি তো থার্ম্মোমিটার আন্‌তে বছর কাটিয়ে দিলে, এদিকে দেখ এসে খোকা কেমন করছে।"

দেখেই বুঝলাম আর না দেখ্‌লেও চলে—খোকার শেষ-মুহূর্ত্ত সন্নিকট ! যে-সময়ে আমি এন্‌ডিওরেন্‌স্ হামাগুড়ির রেকর্ড সৃষ্টি করছিলাম, আমার ভাগ্‌নের অদৃষ্টে সেই সময়ে অন্যবিধ এন-ডিওরেন্‌স্‌এর পরীক্ষা চল্‌ছিল। দেখ্‌লাম বড়্দি নিজেই কোনো রকমে ষ্টোভ্ ধরিয়ে নিয়েছেন—ইতিমধ্যে দু' দু'বার খোকার বুকে পুল্‌টিশ দেওয়া হয়ে গেছে। ওষুধের দিকে তাকিয়ে দেখি সমস্ত বোতল ফাঁক ! 'ওষুধের কি হোলো' জিজ্ঞাসা করতেই বড়্দি জানালেন, দশ মিনিট অন্তর এক চামচ করে খাওয়ানো হয়েচে, তবু তো কই কোনো উপকার দেখা যাচ্ছে না। আমি বল্‌লাম, উপকার দেখা যেত যদি খোকার বদলে তুমি খেতে।

হাত টিপে দেখ্‌লাম, কিন্তু খোকার নাড়ি পেলাম না। খোকার আর অপরাধ কি, যে এক বোতল হুপিংকাফ্ কিওর ওকে উদরস্থ করতে হয়েছে, তাতে কি আর ওর নাড়ি-ভুঁড়ি নিঃশেষ হতে বাকি আছে ? তাড়াতাড়ি ডাক্তারকে ফোন করলাম—"আমাদের খোকা মারা যাচ্ছে।"

পায়জামা-পরণেই ডাক্তার ছুটে এলেন, পরীক্ষা করে' বল্‌লেন—"না, মারা যাচ্ছে না। তা ছাড়া এর হুপিংকাফ্‌ই হয়নি। দেখি।" বলে' খোকার গলার কাছে সুড়সুড়ি দিতেই খোকা বেদম কাশ্‌তে সুরু করল এবং কাশির ধমকে বেরিয়ে এল সূক্ষ্মতম কি একটা জিনিষ। হাতে নিয়ে ভালো করে' দেখে ডাক্তার বল্‌লেন—"এতো পাইন্‌ কাঠের টুক্‌রো দেখ্‌ছি। খোকা বোধ হয় পাইন কাঠের কিছু চিবুচ্ছিল—তার ভগ্নাংশ ভেঙে গলায় গিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।"

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বড়্‌দি বল্লেন—"হুপিংকাশি নয় তাহ'লে এটা কী কাশি?" বড়্‌দির ক্ষোভের কারণ ছিল, সমস্ত রাত ধরে একসঙ্গে হুপিংকাফ্‌, নিউমোনিয়া ও সর্দ্দিগর্ম্মির চিকিৎসার পর সেই প্রাণান্ত পরিশ্রম ব্যর্থ গেছে জান্‌লে কার না দুঃখ হয়?

আমি উত্তর দিলাম, "এক রকম কাষ্ঠ-হাসি আছে জানো তো বড়্‌দি? এটা হচ্ছে তারই ভায়রা-ভাই—কাষ্ঠ-কাশি।"

নরখাদকের কবলে * *

শিরোনাম দেখেই বুঝতে পারছ, এটা একটা ভীষণ য়্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প। যথার্থ-ই তাই, যদিও এটা পড়ে শেষাশেষি হয়ত তোমাদের হাসিই পাবে। সত্যিই ভারা রোমাঞ্চকর ঘটনা—নিতান্তই একবার আমি এক ভয়ঙ্কর নরখাদকের পাল্লায় পড়েছিলাম।

আফ্রিকার জঙ্গলে কি কোনো অজ্ঞাত উপদ্বীপের উপকূলে নয়—এই বাংলাদেশের বুকেই, একদিন ট্রেণে যেতে যেতে। সেই অভাবনীয় সাক্ষাতের কথা স্মরণ করলে এখনো আমার হৃৎকম্প হয়।

বছর আটেক আগের কথা, সবে ম্যাট্রিক্ পাশ করেছি—মামার বাড়ী যাচ্ছি বেড়াতে। রাণাঘাট পর্য্যন্ত যাব, তাই ফূর্ত্তি করে' যাবার মৎলবে বাবার কাছে যা টাকা পেলাম তাই দিয়ে একখানা সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট কিনে ফেল্‌লাম। বহুকাল

থেকেই লোভ ছিল ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড ক্লাসে চাপবার, এতদিনে তার সুযোগ পাওয়া গেল। লোভে পাপ পাপে মৃত্যু—কথাটা প্রায় ভুলে গেছলাম। ভুলে ভালোই করেছিলাম বোধ করি, নইলে এই অদ্ভুত কাহিনী শোনার সুযোগ পেতে না তোমরা।

সমস্ত কাম্‌রাটায় একা আমি, ভাবলাম আর কেউ আসবে না তাহ'লে। বেশ আরামে যাওয়া যাবে একলা এই পথটুকু। কিন্তু গাড়ী ছাড়বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে উঠ্‌লেন। এক মাথা পাকা চুলই তাঁর বার্দ্ধক্যের একমাত্র প্রমাণ, তা নাহ'লে শরীরের বাঁধুনি, চলা-ফেরার উত্তম, বেশ-বাসের ফিট্‌ফাট্‌ কায়দা থেকে ঠিক তাঁর বয়স কত অনুমান করা কঠিন।

গাড়ীতে আমরা দু'জন, বয়সের পার্থক্যেও অল্পক্ষণেই আমাদের আলাপ জমে উঠলো। ভদ্রলোক বেশ মিশুক, প্রথম কথা পাড়লেন তিনিই। এ-কথায় সে-কথায় আমরা দম্‌দম্‌ এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ একটা তারস্বর আমাদের কানে এল—"অজিত, এই অজিত, নেমে পড়্‌ চট্‌ করে। গাড়ী ছেড়ে দিল যে।"

সহসা ভদ্রলোকের সারা মুখ চোখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ত্বরিত দৃষ্টিতে সমস্ত প্লাটফর্ম্মটা একবার তিনি দেখে নিলেন। তারপর

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন—"নাঃ, সে-অজিতের কাছ দিয়েও যায় না!"

কিছু বুঝতে না পেরে আমি বিস্ময়ে হতবাক্ হয়েছিলাম। ভদ্রলোক বল্লেন—"অজিত নামটা শুনে একটা পুরাণো কথা মনে পড়ে গেল আমার। কিন্তু নাঃ, এ-অজিত সে-অজিতের কড়ে-আঙুলের যোগ্যও নয়—এম্‌নি খাসা ছিল সে-অজিত। অমন মিষ্টি মানুষ আমি জীবনে দেখিনি। শুন্‌বে তুমি তার কথা?"

আমি ঘাড় নাড়তে তিনি বল্লেন—"গল্পের মাঝ পথে বাধা দিয়ো না কিন্তু। গল্প বলচি বটে, কিন্তু এর প্রত্যেকটা বর্ণ সত্য। শোনো তবে :

জিভ দিয়ে ঠোঁট্‌টা একবার চেটে নিয়ে তিনি সুরু করলেন : "বছর পঞ্চাশ কি তার বেশিই হবে, তখন উত্তর-বর্ম্মায় যাওয়া খুব বিপদের ছিল। চারিধারে জঙ্গল আর পাহাড়। জঙ্গল কেটে তখন সবে নতুন রেল্ লাইন্ খুলেছে সেই অঞ্চলে—অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাঝে মাঝে এমন ধ্বসে যেত যে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে যেত একেবারে। তার ওপরে পাহাড়ে-ঝড অরণ্য-দাবানল হলে ত কথাই ছিল না। রেঙ্গুন থেকে সাহায্য এসে পৌঁছতে লাগ্‌ত অনেকদিন—এর মধ্যে যাত্রীদের যে কি দুরবস্থা হোতো তা কেবল কল্পনাই করা যেতে পারে।

তখনকার উত্তর-বর্ম্মা ছিল এখনকার চেয়ে ঢের বেশী ঠাণ্ডা, রীতিমত বরফ পড়ত—সময়ে সময়ে চারিধারে সাদা বরফের স্তূপ জমে যেত। এখন তো মগের মুলুকের প্রকৃতি অনেক নম্র হয়ে এসেচে, তার ব্যবহারও এখন ঢের ভদ্র। সেই সময়কার ব্রহ্মদেশের মেজাজ্ ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে।

সেই সময়ে একবার এক ভয়ানক বিপাকে আমি পড়েছিলাম —আমি এবং আরো আঠারো জন। আমরা উত্তর-বর্ম্মায় যাচ্ছিলাম—আমরা উনিশজনই ছিলাম সমস্ত গাড়ীর যাত্রী। উনিশজনই বাঙ্গালী। প্রথম রেল লাইন খুলেছিল, কিন্তু দুর্ঘটনার ভয়ে সেখানকার অধিবাসীরা কেউ রেল গাড়ী চাপ্‌ত না। ভয় ভাঙাবার জন্য রেল কোম্পানি প্রথম প্রথম বিনা-টিকিটে গাড়ী চাপ্‌বার লোভ দেখাতেন। বিনা-পয়সার লোভে নয়, য়্যাড্‌ভেঞ্চারের লোভে রেঙ্গুনের উনিশজন বাঙ্গালী আমরা ত বেরিয়ে পড়লাম।

সহযাত্রী মোটে এই ক'জনা—কাজেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ-পরিচয় হতে দেরি হোলো না। কোন্‌খানে যে সেই ভয়াবহ পাহাড়ে-ঝড় নাম্‌ল, আমার ঠিক মনে পড়ে না এখন, তবে রেলপথের প্রায় প্রান্ত-সীমায় এসে পড়েছি। ওঃ সে কী ঝড়—সেই দুর্দ্দান্ত ঝড় ঠেলে একটু একটু করে' এগুচ্ছিল আমাদের গাড়ী,—অবশেষে একেবারেই থেমে গেল।

সামনের রেল লাইন ছোট বড় পাথরের টুক্‌রোয় ছেয়ে গেছে—সেই সব চাঙ্গড় না সরিয়ে গাড়ী চালানোই অসম্ভব। অতএব পিছোনো ছাড়া উপায় ছিল না।

অনেকক্ষণ ধরে এক মাইল আমরা পিছোলাম, এত আস্তে গাড়ী চল্‌ছিল, চল্‌ছিল আর থাম্‌ছিল, যে মানুষ হেঁটে গেলে তার চেয়ে বেশি যায়। কিন্তু পিছিয়েই কি রেহাই আছে? একটু পরেই জানা গেল যে পিছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ধস্ নেমেছে। ঘণ্টাখানেক মাত্র আগে যে রেলপথ কাঁপিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটেছে, এখন কোথাও তার চিহ্নই নেই।

অতএব আবার এগুতে হোলো। যেখানে যেখানে পাথরের টুক্‌রো জমেছে, আমরা সব নেমে নেমে লাইন পরিষ্কার করব, ঠিক হোলো। তা ছাড়া আর কি উপায় বল? কিন্তু সেদিকেও ছিল অদৃষ্টের পরিহাস। কিছুদূর এগিয়েই ঝড়ের প্রবল ঝাপ্‌টায় ট্রেন্ ডিরেল্‌ড্ হয়ে গেল। লাইন্ থেকে পাথর তোলা এক কথা এবং গাড়ীকে লাইনে তোলা আরেক কথা। পাঁচ দশজনে মিলে অনেক ধরাধরি করলে এক-আধটা পাথরের চাঙ্গড় যে না-সরানো যায় তা নয়, কিন্তু সবাই মিলে বহুৎ ধ্বস্তাধ্বস্তি করলেও গাড়ীকে লাইনে তোলা দূরে থাক্, এক ইঞ্চিও নড়ানো যায় না। এমন কি, আমরা উনিশ জন মিলেও যদি কোমর বেঁধে লাগি, তাহ'লেও তার একটা

কাম্‌রাও লাইনে তুল্‌তে পারব কিনা সন্দেহ! তারপরে ওই লম্বা চৌড়া চোস্ত ইঞ্জিন্‌—ওকে তুল্‌তে হলেই তো চক্ষুস্থির! ওটা কত মণ কে জানে! আমরা ইঞ্জিনের দিকে একবার দৃক্‌পাত করে' হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম।

পেছনের অবস্থা তো দেখেই আসা গেল, সাম্‌নেও যদি তাই ঘটে থাকে, তাহ'লেই তো চক্ষুস্থির! কেননা যেদিক থেকেই হোক্‌, রেলপথ তৈরি করে, সাহায্য এসে পৌঁছতে ক'দিন লাগ্‌বে কে জানে। চারিধারে শুধু পাহাড় আর জঙ্গল, একশ মাইলের ভেতরে মানুষের বাসভূমি আছে কিনা সন্দেহ! ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যা খাবার-দাবার তা তো এক নিশ্বাসেই নিঃশেষ হবে—তারপর? যদি আরো দু'দিন এইভাবে থাক্‌তে হয়? আরো দু' সপ্তাহ? কিম্বা আরো দু' মাস? ভাব্‌তেও বুকের রক্ত জমে যায়।

পরের কথা তো পরে—এখন কি করে' রক্ষা পাই? যে প্রলয় ঝড়, গাড়ী সমেত উড়িয়ে না নিয়ে যায় তো বাঁচি! মাঝে মাঝে যা এক-একটা ঝাপ্‌টা দিচ্ছিল, উড়িয়ে না দিক্‌, গাড়ীকে কাৎ কিম্বা চিৎপাৎ করার পক্ষে তাই যথেষ্ট। নিজের নিজের রুচিমত দুর্গানাম, রামনাম কিম্বা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর নাম জপ্‌তে সুরু করলাম আমরা।

সে-রাত তো কাটল কোনোরকমে। ঝড়ও থেমে গেল

ভোরের দিকটায়, কিন্তু ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও জোর হয়ে উঠ্‌ল। বর্ম্মার হাওয়ায় খুব খিদে হয় শুনেছিলাম, প্রথম দিনেই সেটা টের পাওয়া গেল। খিদের বিশেষ অপরাধ ছিল না—যে-হাওয়াটা কাল আমাদের ওপর দিয়ে গেছে!

কিন্তু নাঃ, কারু টিফিন্ ক্যারিয়ারেই কিছু নেই, যার যা ছিল কাল রাত্রেই চেটে-পুটে সাবাড় করেছে। কেবল য়্যালুমিনাম্ প্লেটগুলো পড়ে' রয়েছে, আমাদের উদরের মত শোচনীয় অবস্থায়—একদম ফাঁকা। সমস্ত দিন যে কি অস্বস্তিতে কাট্‌ল কি বল্‌ব! রাত্রে কষ্ট-কল্পিত নিদ্রার মধ্যে তবু কিছু শান্তির সন্ধান পাওয়া গেল—বড় বড় ভোজের স্বপ্ন দেখ্‌লাম।

দ্বিতীয় দিন যা অবস্থা দাঁড়ালো, তা আর কহতব্য নয়। সমস্ত সময় গল্প-গুজব করে', তর্কাতর্কি করে', বাজে বকে', উচ্চাঙ্গের গবেষণার ভাণ করে', খিদের তাড়ানাটা ভুলে থাক্‌বার চেষ্টা করলাম। গোঁফে চাড়া দিয়ে খিদের চাড়াটা দমিয়ে দিতে চাইলাম,—তারপরে এল তৃতীয় দিন।

সেদিন আর কথা বলারই উৎসাহ নেই কারো—রেল-গাড়ীর চারিদিক ঘুরে, আনাচ-কানাচ লক্ষ্য করে', অসম্ভব আহার্য্যের অস্তিত্ব পরিকল্পনায় সেদিনটা কাট্‌ল। চতুর্থ দিন

আমাদের নড়া-চড়ার স্পৃহা পর্য্যন্ত লোপ পেল—সবাই এক এক কোণে বসে' দারুণভাবে মাথা ঘামাতে লাগালাম।

তারপর পঞ্চম দিন। নাঃ, এবার প্রকাশ করতেই হবে কথাটা—আর চেপে রাখা চলে না। কাল সকাল থেকেই কথাটা আমাদের মনে উঁকি মারছিল, বিকাল-নাগাদ কায়েম হয়ে বসেছিল—এখন প্রত্যেকের জিভের গোড়ায় এসে অপেক্ষা করছে সেই মারাত্মক কথাটা—বোমার মত এই ফাট্‌ল বলে'। বিবর্ণ, রোগা, বিশ্রী বিশ্বনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন, বক্তৃতার কায়দা সুরু করলেন—"সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ",—

কী কথাটা যে আস্‌ছে আমরা সকলেই তা অনুমান করতে পারলাম। উনিশজোড়া চোখের ক্ষুধিত-দৃষ্টি এক মুহূর্ত্তে যেন বদ্‌লে গেল, অপূর্ব্ব সম্ভাবনার প্রত্যাশায় সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে নড়ে'-চড়ে' বস্‌লাম।

বিশ্বনাথবাবু বলে চল্লেন—"ভদ্রমহোদয়গণ, আর বিলম্ব করা চলে না। অহেতুক লজ্জা, সঙ্কোচ বা সৌজন্যের অবকাশ নেই। সময় খুব সংক্ষিপ্ত—আমাদের মধ্যে কোন্ ভাগ্যবান ব্যক্তি আজ বাকি সকলের খাদ্য যোগাবেন, এখনই আমাদের তা স্থির করতে হবে।

শৈলেশবাবু উঠে বল্লেন—আমি ভোলানাথবাবুকে মনোনীত করলাম।

ভোলানাথবাবু বল্লেন—কিন্তু আমার পছন্দ অমৃতবাবুকেই।

অমৃতবাবু উঠ্‌লেন—অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে তিনি লজ্জিত কি মর্ম্মাহত, ঠিক বোঝা গেল না, 'নিজের সুপুষ্ট দেহকেই আজ সবচেয়ে বড় শত্রু বলে' তাঁর বিবেচনা হোলো। আম্‌তা আম্‌তা করে তিনি বল্‌লেন—"বিশ্বনাথবাবু আমাদের মধ্যে প্রবীণ এবং শ্রদ্ধেয়, তা ছাড়া তিনি একজন বড় বক্তাও বটেন। আমার মতে প্রাথমিক সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া উচিত, অতএব তাঁর সপক্ষে আমি নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করছি।"

কমল দত্ত: যদি কারু আপত্তি না থাকে তাহ'লে অমৃতবাবুর অভিলাষ গ্রাহ্য করা হবে।

সুধাংশুবাবু আপত্তি করাতে অমৃতবাবুর পদত্যাগ অগ্রাহ্য হোলো; ঐ একই কারণে ভোলানাথবাবুর রেজিগ্‌নেশনও গৃহীত হোলো না।

শঙ্করবাবু: ভোলানাথবাবু এবং অমৃতবাবু এঁদের মধ্যে কার আবেদন গ্রাহ্য করা হবে, অতঃপর ভোটের দ্বারা তা স্থির করা যাক্।

আমি এই সুযোগ গ্রহণ করলাম—"ভোটাভুটির ব্যাপারে একজন চেয়ারম্যান্ দরকার, নইলে ভোট গুণ্‌বে কে? অতএব আমি নিজেকে চেয়ারম্যান্ মনোনীত করলাম।"

ওদের মধ্যে আমিই ছিলাম দূরদর্শী, সাহায্য এসে না

পৌঁছানো তক্ নিত্যকার ভোটায়নের জন্য চেয়ারম্যান্‌কেই কষ্ট করে' টিকে থাকতে হবে শেষ পর্য্যন্ত, এটা আমি সূত্রপাতেই বুঝতে পেরেছিলাম। অমৃতবাবুর দিকেই সকলের দৃষ্টিনিবদ্ধ থাকাতে, আমি সকলের বিনা-অসম্মতিক্রমে নির্ব্বাচিত হয়ে গেলাম।

অতঃপর প্রভাসবাবু উঠে বল্লেন—আজকের দুপুরবেলার জন্য দু'জনের কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেটা এবার সভাপতি মশাই ব্যালটের দ্বারা স্থির করুন।

নাড়ুবাবু: আমার মতে ভোলানাথবাবু নির্ব্বাচনের গৌরব লাভের অযোগ্য। যদিও তিনি কচি এবং কাঁচা, কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি অত্যন্ত রোগা আর সিড়িঙ্গে। অমৃতবাবুর পরিধিকে অন্ততঃ এই দুঃসময়ে, আমরা অবজ্ঞা করতে পারি না।

শৈলেশবাবু: অমৃতবাবুর মধ্যে কি আছে? কেবল মোটা মোটা হাড় আর ছিব্‌ড়ে। তা ছাড়া পাকা মাংস আমার অপছন্দ, অত চর্ব্বিও আমার ধাতে সয় না। সেই তুলনায় ভোলানাথবাবু হচ্ছেন ভালুকের কাছে পাঁঠা। ভালুকের ওজন বেশি হতে পারে—কিন্তু ভোজনের বেলা পাঁঠাতেই আমাদের রুচি।

নাড়ুবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—অমৃতবাবুর রীতিমত মানহানি

হয়েছে, তাঁকে ভালুক বলা হয়েছে—অমৃতবাবুর ভয়ানক রেগে যাওয়া উচিত আর প্রতিবাদ করা উচিত—

অমৃতবাবু: শৈলেশবাবু ঠিক কথাই বলেছেন, এতবড় খাঁটি কথা কেউ বলেনি আমার সম্বন্ধে। আমি যথার্থই একটা ভালুক।

অমৃতবাবুর মত কূট তার্কিক যে এত সহজে পরের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন, আমি আশা করতে পারিনি। বুঝতে পারলুম, তাঁর আত্মগ্লানির মূলে রয়েছে struggle for existence। যাক্, ব্যালট্ নেওয়া হোলো, কেবল ভোলানাথবাবুর নিজের ছাড়া আর সকলের ভোট তাঁর সপক্ষে গেল। অমৃতবাবুর বেলাও তাই, একমাত্র অমৃতবাবু স্বয়ং নিজের বিপক্ষে ভোট দিলেন।

অগত্যা দু'জনের নাম একসঙ্গে ব্যালটে দেওয়া হোলো—দু'জনেই সমান সমান ভোট পেলেন। অর্দ্ধেক লোক পরিপুষ্টতার পক্ষপাতী, বাকী অর্দ্ধেকের মত হচ্ছে 'যৌবনে দাও রাজটীকা'। এরূপ ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধান সভাপতির উপর নির্ভর করে; আমার ভোটটা অমৃতবাবুর তরফে দিয়ে অশোভন নির্ব্বাচন-প্রতিযোগিতার অবসান করলুম। বলা বাহুল্য, এতদিন একাদশীর পর অমৃতে আমার বিশেষ অরুচি ছিল না।

ভোলানাথবাবুর পরাজয়ে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষ দেখা গেল, তাঁরা নতুন ব্যালট্ দাবী করে' বস্‌লেন। কিন্তু রান্নাবান্নার যোগাড়ের জন্য মহাসমারোহে সভাভঙ্গ হয়ে' যাওয়ায়, ভোলানাথবাবুকে বাধ্য হয়ে স্থগিত থাক্‌তে হোলো। তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা নোটিশ দিয়ে রাখ্‌লেন, পরদিনের নির্ব্বাচনে তাঁরা পুনরায় ভোলানাথবাবুর নাম তুল্‌বেন। কালও যদি যোগ্যতম ব্যক্তির দাবী অগ্রাহ্য করা হয়, তাহ'লে তাঁরা সবাই একযোগে 'হাঙ্গার্-ষ্ট্রাইক্' করবেন বলে' শাসালেন।

কয়েক মুহূর্ত্তেই কি পরিবর্ত্তন! পাঁচদিন নিরাহারের পরে চমৎকার ভোজের প্রত্যাশায় প্রত্যেকের জিভই তখন লালায়িত হয়ে উঠেচে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা যেন আশ্চর্য্য রকম বদ্‌লে গেলাম—কিছুক্ষণ আগে আমরা ছিলাম আশাহীন, ভাষাহীন, প্রত্যাশাহীন, খিদের তাড়নায় উন্মাদ—অর্দ্ধমৃত, আর এখন আমাদের মনে আশা, চোখে দীপ্তি, অন্তরে উচ্ছল ভালোবাসা—এমন একটা প্রগাঢ় প্রেম যা মানুষের প্রতি মানুষ কদাচই অনুভব করে! এমন একটা অপূর্ব্ব পুলক যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! অর্দ্ধ মুমূর্ষুতা থেকে একেবারে নতুন জীবন! আমি শপথ করে' বল্‌তে পারি, তেমন অনির্ব্বচনীয় অনুভূতির আস্বাদ আর জীবনে আমি পাইনি।

অমৃতকে আমি আন্তরিক পছন্দ করেছিলাম। সত্যিই

ভালো লেগেছিল ওকে আমার। স্থূল মাংসল বপু, যদিও কিছু অতিরিক্ত রোমশ (শৈলেশবাবু ভাল্লুক বলে' বেশি ভুল করেননি), তবু ওকে দেখ্‌লেই চিত্ত আশ্বস্ত হয়, মন কেমন খুসি হয়ে ওঠে। ভোলানাথও মন্দ নন অবশ্য, যদিও একটু রোগা, তবু উঁচু দরের জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। তবে পুষ্টিকারিতা এবং উপকারিতার দিক থেকে বিবেচনা করলে অমৃতর দাবী সব প্রথম। অবশ্য ভোলানাথের উৎকৃষ্টতার সপক্ষেও অনেক-কিছু বল্‌বার আছে, তা আমি অস্বীকার করবার চেষ্টা করব না। তবু মধ্যাহ্ন-ভোজনের পাতায় পড়বার যোগ্যতা ওর ছিল না, বড় জোর বিকেলের জলখাবার হিসেবে ওকে ধরা যেতে পারে।

দীর্ঘ উপবাসের পর প্রথম দিনের আহারটা একটু গুরুতরই হয়ে গেল। অমৃত এতটা গুরুপাক হবে আমরা ভাবিনি—বাহিরে থাক্‌তে যিনি আমাদের হৃদয়ে এতটা আবেগ সঞ্চার করেছিলেন, ভিতরে গিয়ে তিনি যথেষ্টই বেগ দিলেন। সমস্ত দিন আমরা অমৃতর ঢেঁকুর তুল্‌লাম। সকলেরই পেট (এবং সঙ্গে সঙ্গে মন) খারাপ থাকায়, পরদিন লঘু পথ্যের ব্যবস্থাই সঙ্গত স্থির হোলো—অতএব কচি ও কাঁচা ভোলানাথবাবুকে জলযোগ করেই সেদিন আমরা নিরস্ত হলুম।

তার পরদিন আমরা অজিতকে নির্ব্বাচিত করলুম। ওরকম

সুস্বাদু কিছু আর কখনো আমরা খাইনি জীবনে। সত্যিই ভারী উপাদেয়, তার বৌকে পরে চিঠি লিখে আমি সে-কথা জানিয়েছি। এক মুখে তার প্রশংসা করে' শেষ করা যায় না —চিরদিন ওকে আমার মনে থাক্‌বে। দেখ্‌তেও যেমন সুশ্রী, তেমনি শিক্ষিত, তেমনি মার্জ্জিত-রুচি, তিন চারটে ভাষায় ওর দখল ছিল। বাংলা তো বল্‌তে পারতই, তা ছাড়া ইংরেজি, হিন্দী এবং উড়েতেও অনর্গল তার খই ফুট্‌ত। হিন্দী একটু ভুলই বল্‌ত, তা বলুক গে, তেম্‌নি এক-আধটু ফ্রেঞ্চ আর জার্ম্মানও ওর জানা ছিল, তাতেই ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছ্‌ল। ক্যারিকেচার্ করতেও জান্‌ত, সুর ভাঁজতেও পারত, বেশ মজ্‌লিশী ওস্তাদ্ লোক—এক কথায় অমন সরেশ জিনিস আর কখনো ভদ্রলোকের পাতে পড়েনি। খুব বেশি ছিবড়েও ছিল না, খুব চর্ব্বিও নয়, ওর ঝোল্‌টাও ভারী খাসা হয়েছিল। এখনো যেন সে আমার জিভে লেগে রয়েছে।

তার পরদিন বিশ্বনাথবাবুকে আমরা আত্মসাৎ করলাম—বুড়োটা যেমন ভূতের মত কালো তেমনি ফাঁকিবাজ, কিচ্ছু তার গায়ে রাখেনি, যাকে বলে আম্‌ড়া—আঁঠি আর চাম্‌ড়া। পাতে বসেই আমি ঘোষণা করতে বাধ্য হলাম : “বন্ধুগণ, তোমাদের যা খুসি করতে পারো, আবার নির্ব্বাচন না হওয়া পর্য্যন্ত আমি কিন্তু হাত গুটালাম।” শৈলেশবাবুও আমার পথে

এলেন, বল্লেন—"আমারো ঐ মত। ততক্ষণ আমিও অপেক্ষা করব।"

অজিতকে সেবা করার পর থেকে, আমাদের অন্তরে যে আত্মপ্রসাদের ফল্গুধারা অগোচরে বইছিল, তাকে ক্ষুণ্ণ করতে কারোই ইচ্ছা ছিল না। কাজেই আবার ভোট নেওয়া সুরু হোলো—এবার সৌভাগ্যক্রমে শৈলেশ বাবুই নির্ব্বাচিত হলেন। তাঁর এবং আমাদের উভয়েরই সৌভাগ্য বল্‌তে হবে; কেন না, কেবল রসিক লোক বলেই তাঁকে জান্‌তাম, সরস লোক বলেও জান্‌লাম তাঁকে। তোমাদের বিশ্ব কবির ভাষায় বল্‌তে গেলে, তাঁর যে-পরিচয় আমাদের কাছে অজ্ঞাত ছিল, সেই নতুন পরিচয়ে তিনি আমাদের অন্তরঙ্গ হলেন।

তারপর? তারপর—একে একে ব্যোমকেশ, নিরঞ্জন, কেদারনাথ, গঙ্গাগোবিন্দ—গঙ্গাগোবিন্দর নির্ব্বাচনে খুব গোলমাল হয়েছিল, কেন না ও ছিল যেমন রোগা তেমনি বেঁটে—তারপরে নিত্যই থোক্‌দার, থোক্‌দারের একটা পা ছিল কাঠের—সেটা একটা থোক্ ক্ষতি, তবে সুস্বাদুতার দিক থেকে সে মন্দ ছিল না নেহাৎ—অবশেষে এক ব্যাটা ভ্যাগাবণ্ড, সঙ্গী হিসাবে সে মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না, খাদ্য হিসাবেও তাই। তবে রিলিফ্ এসে পৌঁছবার আগে যে তাকে খতম্

করতে পারা গেছ্‌ল, এইটাই সুখের বিষয়। নিতান্তই একটা আপদ চুকোনো দায় আর কি !”

রুদ্ধ-নিশ্বাসে আমি ভদ্রলোকের কাহিনী শুন্‌ছিলাম।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে আমি ভদ্রলোকের কাহিনী শুন্‌ছিলাম, এতক্ষণে আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হোলো—তাহ'লে রিলিফ্ এসেছিল শেষে ?

"হ্যাঁ, কবির ভাষায়, একদা সুপ্রভাতে, সুন্দর সূর্য্যালোকে নির্ব্বাচনও সত্ত শেষ হয়েছে, আর রিলিফ্ ট্রেণও এসে পড়ল ! ভগবানকে ধন্যবাদ যে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল, তা নইলে আজ আমাকে দেখবার সৌভাগ্য হ'ত না তোমার।...এই যে বারাক্‌পুর এসে পড়ল, এখানেই আমি নাম্‌ব। বারাক্‌পুরেই আমি থাকি গঙ্গার ধারে, যদি কখনো সুবিধা হয়, দু'একদিনের জন্য বেড়াতে এসো আমার এখানে। ভারী খুসী হব তাহ'লে ! তোমাকে দেখে আমার কেমন বাৎসল্য-ভাব জাগ্‌ছে। বেশ ভালো লাগ্‌ল তোমাকে, এমন কি অজিতকে যতটা ভালো লেগেছিল, প্রায় ততখানিই, একথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হয় না। তুমিও খাসা ছেলে, আচ্ছা আসি তাহ'লে।"

ভদ্রলোক বিদায় হলেন। এমন বিমূঢ়, বিভ্রান্ত আর বিপর্য্যস্ত আমি কখনো হইনি। বৃদ্ধ চলে যাবার পর আমার আত্মাপুরুষ যেন হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃদু-মধুর, চালচলন অত্যন্ত ভদ্র—কিন্তু হলে কি হবে, যখনই তিনি আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন, আমার হাড়-পাঁজ্‌রা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠ্‌ছিল। কি রকম যেন ক্ষুধিত-দৃষ্টি তাঁর চোখে—বাবাঃ !

তারপর তাঁর বিদায়-বাণীতে যখন জানালেন যে, তাঁর মারাত্মক স্নেহ-দৃষ্টি লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, এমন কি তাঁর মতে আমি অজিতের চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নই,—তেম্‌নি খাসা এবং বোধ করি তেম্‌নি উপাদেয়—তখন আমার বুকের কাঁপুনি পর্য্যন্ত বন্ধ হবার মত হয়েছিল।

তিনি যাবার আগে মাত্র একটি প্রশ্ন তাঁকে করতে পেরেছিলাম—"শেষ পর্য্যন্ত আপনাকেও ওরা নির্ব্বাচন করেছিল। আপনি তো সভাপতি ছিলেন, তবে কি করে' এটা হোলো?"

"শেষ পর্য্যন্ত আমিই বাকি ছিলাম কিনা! আগের দিন ভ্যাগাবণ্ডটার পালা গেছল; আমি একাই সমস্তটা-ওকে সাবাড় করেছিলুম। বল্‌ব কি, পাহাড়ের হাওয়ায় যেমন আমার খিদে হোতো, তেম্‌নি শেষাশেষি হজম করবার ক্ষমতাও খুব বেড়ে গেছল। হতভাগা লোফারটা শেষ পর্য্যন্ত টিকেই ছিল, তার কারণ অখদ্যে লোক বলে' তাকে খাদ্য করতে আর সবার আপত্তি ছিল। কিন্তু খাবার জিনিসে অত গোঁড়ামি নেই আমার —উদরের ব্যাপারে আমি খুব উদার। তা ছাড়া, এতদিনেও নির্ব্বাচিত হবার সুযোগ না পেয়ে নিশ্চয়ই অত্যন্ত মনক্ষোভ জেগেছিল ওর; আমার কাছে আত্মমর্য্যাদা লাভ করে' সে যে কৃতার্থ হয়েছে এতে আমার সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, তুমি কি জান্‌তে চাচ্ছিলে, কি করে' আমার পালা হোলো? পরদিন আবার নির্ব্বাচনের সময় এল। কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায়, আমি যথারীতি নির্ব্বাচিত হয়ে গেলুম বিনা বাধায়। তারপর কারু আপত্তি না থাকায়, আমি তৎক্ষণাৎ সেই সম্মানার্হ পদ পরিত্যাগ করলুম। আপত্তি করবার কেউ ছিলও না তখন। ভাগ্যিস্ ঠিক সময়ে এসে পৌঁছেছিল ট্রেণটা—দুরূহ কর্ত্তব্যের দায় থেকে রেহাই পেলাম আমি—নিজেকে আর গলাধঃকরণ করতে হোলো না আমার।"

আমার ভালুক শিকার * *

তোমরা আমাকে গল্প লেখক বলেই জানো। কিন্তু আমি যে একজন ভালো শিকারী, এ খবর নিশ্চয়ই তোমাদের জানা নেই। আমি নিজেই এ কথা জানতুম না, শিকার করার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত!

(আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, কোথায় কোথায় নাকি দশ-বারো বছরের ছেলেরা, দশ-বারো হাত বাঘ শিকার করে' ফেলেছে। আজকের ৭ই জুলাইয়ের খবরের কাগজেই তোমরা দেখ্‌বে, একটা সাত বছরের ছেলে ন' ফিট্ বাঘ সাবাড় করে' দিয়েছে। বাঘটার উপদ্রবে গ্রামশুদ্ধ লোকে ভীত সন্ত্রস্ত। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিল না। ভাগ্যিস্ সেখানকার তালুকদারের একটা ছেলে ছিল এবং আরো সৌভাগ্যের কথা যে তার বয়স ছিল মোটে বছর সাত, তাই গ্রামবাসীদের বাঘের কবল থেকে এত সহজে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হোলো।

তোমরা হয়ত বল্‌বে যে, ছেলেটার ওজনের চেয়ে বন্দুকের ওজনই যে ভারী। তা হতে পারে, তবু এ কথা আমি অবিশ্বাস করি না, বিশেষ করে যখন খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে নিজের চোখে দেখেছি। আমার ভালুক শিকারের খবরটাও কাগজেই দেখেছিলাম—তারপর থেকেই তো ঘটনাটায় আমার দারুণ বিশ্বাস হয়ে গেছে। প্রথমে আমি ধারণা করতেই পারিনি যে আমিই ভালুকটাকে মেরেছি, এবং ভালুকটারও মনে যেন সেই সন্দেহ বরাবর ছিল মনে হয়, মরার আগে পর্য্যন্ত। কিন্তু যখন খবরের কাগজে আমার শিকার-কাহিনী নিজে পড়লাম, তখন নিজের কৃতিত্ব সম্বন্ধে অমূলক ধারণা আমার দূর হোলো। ভালুকটার সন্দেহ বোধ করি শেষ অবধি থেকেই গেছল, কেন না খবরের কাগজটা চোখে দেখার পর্য্যন্ত তার সুযোগ হয়নি—কিন্তু না হোক্‌, সে নিজেই দূর হয়ে গেছে।)

সেই রোমাঞ্চকর ঘটনাটা এবার তোমাদের বলি: আমার মাস্তুতো বড়্‌দা সুন্দরবনের দিকে অনেক জমি-টমি নিয়ে চাষ-বাস সুরু করেছেন। সেদিন তাঁর চিঠি পেলাম—"এবার গ্রীষ্মটা এ ধারেই কাটিয়ে যাও না, নতুন জীবনের আস্বাদ পাবে, অভিজ্ঞতাও বেড়ে যাবে অনেক। সঙ্গে করে' কিছুই আন্‌তে হবে না, কেবল কয়েক জোড়া কাপড় এনো।"

আমি লিখ্‌লুম—যেতে লিখেছ যাব না-হয়। কিন্তু কাপড় নিয়ে যেতে হবে কেন বুঝতে পারলুম না। আমার সূট্‌কেসে তো দু'খানার বেশি ধরবে না, এবং বাড়্‌তি বোঝা বইতে আমি নারাজ। আর তা ছাড়া এই সেদিনই তো তুমি কলকাতা থেকে বারো জোড়া কাপড় নিয়ে গেছ! অত কাপড় সেখানে কি করো? বৌদি নিশ্চয়ই ধুতি পরা ধরেননি। তোমার কাপড়েই আমার চলে যাবে—তুমি তো একলা মানুষ, বাপু!

দাদা সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন—আর কিছু না, বাঘের জন্য।

আমার সবিস্মিত পাল্‌টা জবাব গেল—সে কি! বাঘে ছাগল গরুই চুরি করে শুনেছি, আজকাল কাপড়-চোপড়ও সরাচ্ছে নাকি? কাপড়-চোপড়ের ব্যবহার যখন শিখেচে, তখন তারা রীতিমত সভ্য হয়েছে বল্‌তে হবে।

দাদা উত্তর দিলেন—চিঠিতে অত বক্‌তে পারি না। আমার এখানে এসে তোমার কাপড়ের অভাব হবে না, এ কথা নিশ্চয়ই—কিন্তু যে-কাপড় তোমাকে আন্‌তে বলেছি, তার দরকার পথেই। চিড়িয়াখানার বাঘই দেখেছ, আসল বাঘ তো কোনোদিন দেখোনি, আসল বাঘের হুহুঙ্কারও শোনোনি। চিড়িয়াখানার ও-গুলোকে বেড়াল বল্‌তে পারো। সুন্দর বন দিয়ে ষ্টীমারে আস্‌তে দু'পাশের জঙ্গলে বাঘের হুঙ্কার শোনা যায়, শোনামাত্রই কাপড় বদ্‌লানোর প্রয়োজন অনুভব করবে।

প্রায় সকলেই সেটা করে থাকেন। যত ঘন ঘন ডাক্‌বে, (ডাকাটা অবশ্য তাদের খেয়ালের ওপর নির্ভর করে) তত ঘন ঘনই কাপড়ের প্রয়োজন। তবে তুমি যদি খাকী প্যাণ্ট্‌ পরে আসো, তাহ'লে দরকার হবে না।

অতঃপর, চব্বিশ জোড়া কাপড় কিনে নিয়ে আমি সুন্দর বন গমন করলাম।

আমার মাস্তুতো দাদাও একজন বড় শিকারী। এ তথ্যটা আগে জান্‌তাম না, এবার গিয়ে জান্‌লাম। শুধু হাতেই অনেক দুর্দ্ধর্ষ বাঘকে তিনি পট্‌কে ফেলেছেন। বন্দুক নিয়েও শিকারের অভ্যাস তাঁর আছে, কিন্তু সে রকম সুযোগে তিনি বন্দুককে লাঠির মত ব্যবহার করতেই ভালোবাসেন। তাঁর মতে কেঁদো বাঘকে কাঁদাতে হলে বন্দুকের কুঁদোই প্রশস্ত— গুলি করা কোনো কাজের কথাই নয়। কিছুদিন আগে এক বাঘের সঙ্গে তাঁর বড় হাতাহাতি হয়ে গেছল, তাঁর নিজের মুখেই আমার শোনা। বাঘটার অত্যাচার বেজায় বেড়ে গেছল, সমস্ত গ্রামটার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাত ব্যাটা, এমন কি তাদের স্বপ্নের মধ্যে এসে হানা দিত পর্য্যন্ত।

দাদার নিজের ভাষাতেই বলি :—"তারপর তো ভাই বেরুলাম বন্দুক নিয়ে। কি করি, সমস্ত গ্রামের অনুরোধ। ঠেলাতো যায় না—একাই গেলাম। সঙ্গে লোকজন নিয়ে

শিকারে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। একবার অনেক লোক সঙ্গে নিয়ে গিয়ে যা বিপদ্দে পড়েছিলাম, কি বল্‌ব! বাঘ কর্‌ল তাদের তাড়া, তারা এসে পড়্‌ল আমার ঘাড়ে, মানুষের তাড়ায় প্রাণে মারা যাই আর কি! গেলাম। কিছুদূর যেতেই দেখি সম্মুখে বাঘ, বন্দুক ছুঁড়তে গিয়ে জান্‌লাম টোটা আনা হয়নি—আর সে বন্দুকটা এমন ভারী যে, তাকে লাঠির মতও খেলানো যায় না। কি করি, বন্দুক ফেলে দিয়ে শুধু হাতেই বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। জোর ধ্বস্তাধ্বস্তি, কখনো বাঘ উপরে আমি নীচে, কখনো আমি নীচে বাঘ উপরে—বাঘটাকে প্রায় কাবু করে এনেছি এমন সময়ে—"

আমি রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করছি, বৌদি বাধা দিয়ে বল্লেন—"এমন সময়ে তোমার দাদা গেলেন তক্তপোষ থেকে পড়ে। জলের ছাঁট্‌ দিয়ে, হাওয়া করে, অনেক কষ্টে ওঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। মাথাটা গেল কেটে, তিন দিন জলপটি দিতে হয়েছিল।"

এর পর দাদা বারো দিন আর বৌদির সঙ্গে বাক্যালাপ করলেন না এবং মাছের মুড়ো সব আমার পাতেই পড়তে লাগ্‌ল।

দাদা একদিন চুপি চুপি আমায় বল্লেন—তোমার বৌদির কীর্ত্তি জানো না তো! খুকীকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে জাম

কুড়োতে গিয়ে, পড়েছিলেন এক ভালুকের পাল্লায়। খুকীতো পালিয়ে এল, উনি ভয়ে জবু-থবু হয়ে, একটা উইয়ের ঢিপির উপর বসে পড়ে, এমন চেঁচামেচি আর কান্নাকাটি সুরু করে দিলেন যে, ভালুকটা ওঁর ব্যবহারে লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।

আমি বল্লাম—ওঁর ভাষা না বুঝতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছ্ল, এমনো তো হতে পারে!

দাদা বিরক্তি প্রকাশ করলেন—হ্যাঃ! ভারি ত ভাষা! প্রত্যেক চিঠিতে দুশো করে' বানান ভুল!

বৌদির পক্ষ সমর্থন করতে আমাকে, অন্ততঃ মাছের মুড়োর কৃতজ্ঞতা-সূত্রেও, বল্‌তে হোলো—"ভালুকরা শুনেছি সাইলেণ্ট্ ওয়ার্কার, বক্তৃতা-টক্তৃতা ওরা বড় পছন্দ করে না। কাজেই বৌদি ভালুক তাড়াবার ব্রহ্মাস্ত্রই প্রয়োগ করেছিলেন, বুঝলে দাদা?"

দাদা কোনো জবাব দিলেন না, আপন মনে গজ্‌রাতে লাগ্‌লেন। বৌদির তরফে আমার ওকালতি শুনে তিনি মুষ্‌ড়ে পড়লেন, কি ক্ষেপে গেলেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। কিন্তু সেদিন বিকালেই তাঁর মনোভাব টের পাওয়া গেল। দাদা আমাকে হুকুম করলেন, পাশের জঙ্গল থেকে এক ঝুড়ি জাম কুড়িয়ে আন্‌তে—সেই জঙ্গল, যেখানে বৌদির সঙ্গে ভালুকের প্রথম দর্শন হয়েছিল।

দাদার গরহজম হয়েছিল, তাই জাম খাওয়া দরকার, কিন্তু আমি দাদার ডিপ্লোমাসি বুঝতে পারলাম। আমাকে ভালুকের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আমাকে শুদ্ধ বিনা আয়াসে হজম করার মৎলব। বুঝলাম বৌদির পক্ষে যাওয়া আমার ভালো হয়নি। আম্‌তা-আম্‌তা করছি দেখে দাদা বল্লেন—আমার বন্দুকটা না হয় নিয়ে যা, কিন্তু দেখিস্, ভুলে ফেলে আসিস্ না যেন।

ওঃ, কী কূটচক্রী আমার মাস্তুতো বড়্‌দা! ভালুকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা বরং আমার পক্ষে সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বন্দুক ছোঁড়া— ? একলা থাক্‌লে হয়ত দৌড়ে পালিয়ে আস্‌তে পারব, কিন্তু ঐ ভারী বন্দুকের হ্যাণ্ডিক্যাপ্ নিয়ে দৌড়তে হলে, সেই রেসে ভালুকই যে প্রথম হবে, এ বিষয়ে আমার যেমন সন্দেহ ছিল না, দেখ্‌লাম দাদাও তেমনি স্থির-নিশ্চয়।

দাদা জামের ঝুড়ি আর বন্দুকটা আমার হাতে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—চট্ করে যা, দেরি করিস্‌নি। তোর ভয় কর্চ্ছে নাকি ?

অগত্যা আমায় বেরুতে হোলো। বেশ দেখ্‌তে পেলুম, আমার মাস্তুতো বড়্‌দা আড়ালে একটু মুচ্‌কি হেসে নিলেন। মাছের-মুড়োর বিরহ তাঁর আর সহ্য হচ্ছিল না। নাঃ, এই বিদেশে বিভুঁয়ে মাস্তুতো ভাইয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসে

ভালো করিনি। খতিয়ে দেখ্লাম, ওই চব্বিশ জোড়া কাপড়ই বড়্দার নেট্ লাভ।

বেরিয়ে পড়লাম। এক হাতে ঝুড়ি, আরেক হাতে বন্দুক। নিশ্চয়ই আমাকে খুব বীরের মত দেখাচ্ছিল। যদিও একটু বিশ্রী রকমের ভারী, তবু বন্দুকে আমায় বেশ মানায়। ক্রমশঃ মনে সাহস এলো—আসুক না ব্যাটা ভালুক, তাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং বড়দাকেও! মাসতুতো ভাই কেবল চোরে-চোরেই হয় না, শিকারীতে-শিকারীতেও হতে পারে! উনিই একজন বড় শিকারী, আর আমি বুঝি কিছু না?

বন্দুকটা বাগিয়ে ধরলাম। আসুক না ব্যাটা ভালুক এইবার! ঝুড়িটা হাতে নেওয়ায় যতটা মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা লাঘব হয়েছিল, বন্দুকে তার ঢের বেশি পুষিয়ে গেছে। আমাকে দেখাচ্ছে ঠিক বীরের মত। অথচ দুঃখের বিষয়, এই জঙ্গল পথে একজনও দেখ্বার লোক নেই। এ সময়ে একটা ভালুককে দর্শকের মধ্যে পেলেও আমি পুলকিত হতাম।

বন্দুক কখনো যে ছুঁড়িনি তা নয়। আমার এক বন্ধুর একটা ভালো বন্দুক ছিল, হরিণ-শিকারের উচ্চাভিলাষ বশে তিনি ওটা কিনেছিলেন। বহুদিনের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তিনি গাছ-শিকার করতে পারতেন। তিনি বলতেন—গাছ-শিকারের অনেক সুবিধে, প্রথমতঃ গাছেরা হরিণের মত অত দৌড়য় না,

এমন কি ছুটে পালাবার বদভ্যাসই নেই ওদের, দ্বিতীয়তঃ—ইত্যাদি, সে বিস্তর কথা। তা, তিনি সত্যিই গাছ-শিকার করতে পারতেন—অন্ততঃ বাতাস একটু জোর্ না বইলে, উপযুক্ত আব্‌হাওয়ায় এবং গাছটাও হাতের কাছে হলে, তিনি অনায়াসে লক্ষ্য ভেদ করতে পারতেন—প্রায় প্রত্যেক বারই।

আমিও তাঁর সঙ্গে গাছ-শিকার করেছি, তবে যে-কোনো গাছ আমি পারতুম না। আকারে-প্রকারে কিছু বড় হলেই আমার পক্ষে সুবিধা হোতো, গুঁড়ির দিকটাতেই আমার স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। বৃক্ষ-শিকারে যখন এতদিন হাত পাকিয়েছি, তখন ঋক্ষ-শিকারে যে একেবারে বেহাত হব না, এ ভরসা আমার ছিল।

জঙ্গলে গিয়ে দেখি পাকা পাকা জামে গাছ ভর্ত্তি! জাম দেখে জাম্বুবানের কথা আমি ভুলেই গেলাম। এমন বড় বড় পাকা পাকা খাসা জাম! জিভ্ লালায়িত হয়ে উঠ্‌ল। বন্দুকটা একটা গাছে ঠেসিয়ে, দু'হাতে ঝুড়ি ভরতে লাগ্‌লাম। কতক্ষণ কেটেছে জানি না, একটা খস্ খস্ শব্দে আমার চমক্ ভাঙ্‌ল। চেয়ে দেখি—ভালুক!

ভালুকটা পেছনের পায়ে ভর্ দিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমি যা করছি সেও তাতেই ব্যাপৃত। একহাত দিয়ে জামের একটা নীচু ডাল্‌কে সে বাগিয়ে ধরেছে, অন্য হাতে নির্ব্বিচারে

মুখে পুর্ছে—কাঁচা ডাঁসা সমস্ত। আমি বিস্মিত হলাম বল্লে বেশি বলা হয় না! বোধ হয়, আমি ঈষৎ ভীতই হয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হোলো, ভালুক-দর্শনের বাঞ্ছা একটু আগেই করেছি বটে, কিন্তু দেখা না পেলেই যেন আমি বেশি আশ্বস্ত হতাম। ঠিক সেই মারাত্মক মুহূর্ত্তেই আমাদের চারি চক্ষুর মিলন!

আমাকে দেখেই ভালুকটা জাম খাওয়া স্থগিত রাখ্ল এবং বেশ একটু পুলকিত-বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগ্ল। আমি মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্লাম। গাছে উঠ্তে পারলে বাঘের হাত থেকে নিস্তার আছে, কিন্তু ভালুকের হাতে কিছুতেই পরিত্রাণ নেই। ভালুকরা গাছে উঠ্তেও ওস্তাদ।

অগত্যা শ্রেষ্ঠ উপায়—পালিয়ে বাঁচা। বন্দুক ফেলে যেতে দাদার নিষেধ, বন্দুকটা বগ্ল-দাবাই করে চোঁচা দৌড় দেবার মৎলব করেছি, দেখ্লাম সেও আস্তে আস্তে আমার দিকে এগুচ্ছে। আমি দৌড়লেই সে যে আমার পিছু নিতে দ্বিধা বোধ করবে না, আমি তা বেশ বুঝতে পারলাম। ভালুকজাতির ব্যবহার, আমার মোটেই ভালো লাগ্ল না।

আমিও দৌড়চ্ছি, ভালুকও দৌড়চ্ছে। বন্দুকের বোঝা নিয়ে ভালুক-দৌড়ে আমি সুবিধা করতে পারব না বুঝতে পারলাম। যদি এখনও বন্দুকটা না ফেলে দিই, তাহ'লে

নিজেকেই এখানে ফেলে যেতে হবে। অগত্যা অনেক বিবেচনা করে' বন্দুককেই বিসর্জ্জন দিলাম।

কিছুদূর দৌড়ে ভালুকের পদশব্দ না পেয়ে ফিরে তাকালাম। দেখলাম সে আমার বন্দুকটা নিয়ে পড়েছে। ওটাকে নতুন রকমের কোনো খাদ্য মনে করেছে কিনা ওই জানে! আমিও স্তব্ধ হয়ে ওর কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিলাম।

ভালুকটা বেশ বুদ্ধিমান। অল্পক্ষণেই সে বুঝতে পারল ওটা খাদ্য নয়, হাতে নিয়ে দৌড়বার জিনিস। এবার বন্দুকটা হস্তগত করে সে আমাকে তাড়া করল। বিপদের উপর বিপদ —এবার আমার বিপক্ষে ভালুক এবং বন্দুক। ভালুকটা কি রকম শিকারী আমার জানা ছিল না। বন্দুকে ওর হাত অন্ততঃ আমার চেয়ে খারাপ নয় বলেই আমার আন্দাজ।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। কয়েক লাফ্ না যেতেই পেছনে বন্দুকের আওয়াজ। আমি চোখ কান বুঁজে সটান্ শুয়ে পড়লাম,—যাতে গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়—যুদ্ধের তাই রীতি কিনা! তারপর আবার দুড়ুম্! 'আবার আবার সেই বন্দুক গর্জ্জন!' আমি দুরু দুরু বক্ষে শুয়ে শুয়ে দুর্গানাম করতে লাগ্লাম। ভালুক শিকার করতে এসে ভালুকের হাতে না 'শিকৃত' হয়ে যাই!

এবার বন্দুকটা হস্তগত করে ভালুকটা আমাকে তাড়া করল।

আমি চোখ বুজেও যেন স্পষ্ট দেখ্‌ছিলাম, ভালুকটা আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছে। তার গুলিতে আমি হতাহত—অন্ততঃ একটা কিছু যে হয়েছি, সে বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। গুলির আঘাতে না যাই, ভালুকের আঘাতে এবার গেলাম! মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে জীবনের সমস্ত ঘটনা, বায়স্কোপের ফিল্‌মের মত, মনশ্চক্ষের উপর দিয়ে চলে যায় বলে একটা গুজব শোনা ছিল। সত্যিই তাই—একেবারে হুবহুব্! ছোটবেলার পাঠশালা পালিয়ে, আম্র-শিকার থেকে সুরু করে আজকের ভালুক শিকার পর্য্যন্ত—প্রায় চারশো পাতার একটা মোটা সচিত্র জীবন-স্মৃতি আমার মনে মনে ভাবা, লেখা, ছাপানো, প্রুফ কারেক্ট্ করা—এমন কি তার পাঁচ হাজার কপি বিক্রি অবধি শেষ হয়ে গেল।

জীবন-স্মৃতি রচনার পর আত্মীয়-স্বজনের কথা আমার স্মরণে এল। পরিবার আমার খুব সামান্যই—একমাত্র মা এবং একমাত্র ভাই—সুতরাং সে দুশ্চিন্তা সমাধা করাও খুব কঠিন হোলো না। এক সেকেণ্ড—দু' সেকেণ্ড—তিন—চার—পাঁচ সেকেণ্ড—এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, কিন্তু ভালুক বেটা এখনো এসে পৌঁছল না তো! কি হোলো তার? এতটা দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে না কি?

ঘাড়টা ফিরিয়ে দেখি, ওমা, সেও যে সটান্ চিৎপাৎ!

সাহস পেয়ে উঠে দাঁড়ালাম—এ ভালুকটা তো ভারি অনুকরণ-প্রিয় দেখ্‌ছি! কিন্তু নড়ে না—চড়ে না যে! কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম, নিজের বন্দুকের গুলিতে নিজেই মারা গেছে বেচারা! বুঝলাম, অত্যন্ত মনক্ষোভেই এই অন্যায়টা সে করেছে! প্রথম দিন বৌদির ব্যবহারে সে লজ্জা পেয়েছিল, আজ আমার কাপুরুষতার পরিচয়ে সে এতটা মর্ম্মাহত হয়েছে যে আত্মহত্যা করা ছাড়া তার উপায় ছিল না।

বন্দুক হাতে সগর্ব্বে বাড়ী ফিরলাম। আমার জাম-হীনতা লক্ষ্য করে' দাদার অসন্তোষ প্রকাশের পূর্ব্বেই ঘোষণা করে দিলাম—"বৌদির প্রতিদ্বন্দ্বী সেই ভালুকটাকে আজ নিপাত করে এসেছি! কেবল দুটো শট্—ব্যস্ খতম্!"

দাদা বৌদি এমন কি খুকী পর্য্যন্ত দেখ্‌তে ছুট্‌ল। আমিও চল্লাম—এবার আর বন্দুকটাকে সঙ্গে নিলাম না, পাঁচজনে যাত্রা নিষেধ, পাঁজিতে লেখে। দাদা বহু পরিশ্রমে ও বৌদির সাহায্যে, ভালুকের ল্যাজটাকে দেহচ্যুত করে', এই বৃহৎ শিকারের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ, সযত্নে আহরণ করে' নিয়ে এলেন। এই সহযোগিতার ফলে দাদা ও বৌদির মধ্যে আবার ভাব হয়ে গেল। আপনি আত্মদান করে' ভালুকটা দাদা ও বৌদির মধ্যে মিলন-গ্রন্থি রচনা করে' গেল—তার এই অসাধারণ মহত্ত্বে সে নতুন মহিমা নিয়ে আমার কাছে প্রতিভাত হোলো।

আমার রচনায় তাকে অমর করে রাখলুম, অন্ততঃ আমার চেয়ে সে বেশিদিন টিক্‌বে আশা করি। ।

বাড়ী ফিরেই দাদা বল্লেন—অমৃতবাজার পত্রিকায় খবরটা পাঠিয়ে দিই, কি বলিস্? A big wild bear was heroically killed by my young brother aged—aged কত রে?

"আমার age তুমি তো জানোই!"—আমি উত্তর দিলাম।

"উঁহু, কমিয়ে লিখ্‌তে হবে কিনা! নইলে বাহাদুরি কিসের! দশ-বারো বছর কমিয়ে দিই কি বলিস্?"

কিন্তু দশ-বারো বছর কমিয়েও আমার বয়স যখন দশ-বারো বছরের কাছাকাছি আনা গেল না—(সাতে দাঁড় করানো তো দুঃসাধ্য ব্যাপার!) তখন বাধ্য হয়ে "Young" এই বিশেষণের উপর নির্ভর করে, আমার বয়সাল্পতাটা লোকের অনুমানের উপর ছেড়ে দেওয়া গেল।

সেদিন আমার পাতে দু'-দুটো মুড়ো পড়ল, খুকী মাকে বলে রেখেছে তার মুড়োটা কাকামণিকে দিতে। আমি আপত্তি করলাম না, ভালুকের আত্মবিসর্জ্জনে যখন করিনি, খুকীর মুড়ো বিসর্জ্জনেই বা করব কেন? সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই, আমার ঝোলের বাটির অস্বাভাবিক উচ্চতা দেখেও, দাদা আজ ভ্রূক্ষেপ করলেন না!

ভালুকের মহাপ্রস্থান * *

গল্প কেমন লিখি জানিনে, কিন্তু শিকারী হিসাবে যে নেহাৎ কম যাই না, এই বইয়ের "আমার ভালুক শিকারেই" তোমরা তার পরিচয় পেয়েছ। আমার মাস্তুতো বড়্দাদাও যে কত বড় শিকারী, তাও তোমাদের আর অজানা নেই। এবার আমার মামাত ছোট ভাইয়ের একটা শিকার-কাহিনী তোমাদের বল্ব। পড়লেই বুঝবে, ইনিও নিতান্ত কম যান না। হবে না কেন, আমারই ছোট ভাই তো!

গল্পটা, যতদূর সম্ভব, তার নিজের ভাষাতেই বলবার চেষ্টা করা গেল :

ভালুকদের ওপর আমার বরাবর ঝোঁক্, ছোটবেলা থেকেই। দাদার ভালুক শিকারের গল্পটা শুনে অবধি, ভালুকদের ওপর

আমার ছোটবেলার টান্‌টা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। সর্ব্বদাই মনে হয়, কোন্ ফাঁকে একটা ভালুক শিকার করি। কিন্তু শিকারের জন্য এয়ার্‌-গান্ পাওয়া সোজা হতে পারে (আমাদের দেবুরই একটা আছে)—কিন্তু ভালুক যোগাড় করাই শক্ত। অবশ্য রাস্তায় প্রায়ই ভালুকওয়ালাদের দেখা পাওয়া যায়, সে সব নিঃসন্দিগ্ধ নৃত্যপটু ভালুকদের শিকার করাও অনেকটা সহজ, কিন্তু তাতে ভালুকদের আপত্তি না থাক্‌লেও তাদের গার্জ্জেন্‌দের রাজী করানো যাবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু চমৎকার সুযোগ মিলে গেল হঠাৎ। আমাদের পাহাড়ে দেশে সার্কাস্‌-টার্কাস্ বড় একটা আসে না। সার্কাস্ দেখ্‌তে হ'লে আমরা কলকাতায় যাই বড়দিনে দাদার ওখানে। যাই হোক্, এবার একটা সার্কাস্ এসে পড়েছে আমাদের অঞ্চলে। শুন্‌লাম, অনেকগুলো ভালুকও এনেছে তারা। ভারী আনন্দ হ'ল।

দেবুকে গিয়ে বল্লাম, "এই, তোর বন্দুকটা দিবি দিন কত'র জন্য ?"

"কি কর্‌বি ?"

"ভালুক শিকারের চেষ্টা দেখ্‌ব।"

"আমার এটা তো এয়ার্‌-গান্, এতে কি ভালুক মরে ? কেন, অমল, তোর তো সেজ কাকারই ভাল বন্দুক রয়েছে !"

"দূর্, সেটা বেজায় ভারী। তোলাই দায়, ছোঁড়া তো পরের কথা। তা ছাড়া আমি একটা গল্পে পড়েছি, ভারী বন্দুক ভালুক শিকারের পক্ষে বড় সুবিধের ব্যাপার নয়।"

"ও, তোর সেই দাদার গল্পটা? কিন্তু আমি যে এটা দিয়ে কাক মারি।"

এটা হ'ল গিয়ে দেবুর স্রেফ্ চাল। বল্‌লে কাক মারি, কিন্তু আসলে ওই দিয়ে ও মাছি তাড়ায়। এয়ার্-গান্ থাকে ওর পড়ার টেবিলে, সেখানে কাক একটাও নেই, কিন্তু যত রাজ্যের মাছি।

"বেশ আমি তোকে একটা জিনিস দেব, তাতে মারা না যাক্ কাক ধরা পড়বে।" দেবু উৎসুকচোখে তাকায়। "আমার ক্যামেরাটা দেব তোকে ওর বদলে। কাকের ছবি ধরা আর কাক ধরা একই ব্যাপার নয় কি?"

দেবু সে কথা মেনে নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হয়ে উঠে। আমার 'জাইস্ আইকনে'র সঙ্গে ওর বন্দুকের বিনিময় ক'রে আমরা দু'জনেই বেরিয়ে পড়ি সার্কাসের তাঁবুর উদ্দেশে— ভালুক মারার মৎলব নিয়ে আমি, আর ভালুক ধরার উৎসাহ নিয়ে দেবু।

বাজারের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেবু এক গাদা কালো জাম কেনে। আমার দিকে, বোধ করি তার স্মরণশক্তির

পরিচয় দেবার জন্যই, গর্ব্বভরে তাকায়—"জানিস্ না, ভালুকেরা জাম খেতে ভালোবাসে ?"

হুঁ, জানি ; কিন্তু যাকে শিকার করতে যাচ্ছি তাকে জাম খাওয়ানো আমি পছন্দ করি না—সাবাড়ের আগে খাবারের ব্যবস্থা একটা নিষ্ঠুর ব্যবহার নয় কি ? আমার মতে ওটা দস্তুরমত অত্যাচার—ভালুকের প্রতি এবং নিজের পকেটের প্রতি। দেবুকে জবাব দিই, "ভালুকের সঙ্গে ভাব করা তো মৎলব নেই আমার !"

সার্কাসের তাঁবুর পেছন দিক্‌টায় জানোয়ারের "মিনেজারী" —হাতী, ঘোড়া, বাঘ, সিংহ, ভালুক, জেব্রা—একটা উটও দেখলাম। খোঁটায় বাঁধা হাতী শুঁড় তুলে অপরিচিত লোককেও সেলাম ঠুক্‌ছে, জেব্রা এবং উটও কম দর্শক আকর্ষণ করেনি। কতকগুলো ছোঁড়া বাঘের খাঁচার দিকে গিয়ে ভিড়েছে, ওদের আফিং খাইয়ে রাখা হয় কিনা এই হ'ল ওদের আলোচ্য বিষয়। দেখা গেল, বাঘেরা মনোযোগ দিয়ে সেই গবেষণা শুনছে এবং মাঝে মাঝে হাই তুলে ওদের কথা সমর্থন করছে।

মোটের উপর সমস্তটা জড়িয়ে বেশ উপভোগ্য ব্যাপার। কিন্তু এ সমস্ত থেকে কঠোরভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে ভালুকের খাঁচার দিকে আমরা অগ্রসর হলাম। পথে-ঘাটে

সর্ব্বদাই যাদের দেখা মেলে স্বভাবতঃই তাদের মর্য্যাদা কম; বেচারা ভালুকদের বরাতে তাই একটিও 'য়্যাড্‌মায়ারার্' জোটেনি।

একটি বড় খাঁচার একধারে দু'টো মোটাসোটা ভালুক—আর তার পাশেই, পার্টিশান্-করা অন্য ধারে একটা বেঁটে ভালুক! পার্টিশানের মাঝখানের দরজাটা বাইরে থেকে লাগানো। এতক্ষণ অবধি কোন সমঝ্‌দার না পেয়ে মোটা ভালুক দু'টো যেন মুষ্‌ড়ে পড়েছিল, আমাদের দু'জনকে যেতে দেখে নড়ে-চড়ে বস্‌ল। কিন্তু বেঁটে ভালুকটার বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই! বুঝলাম নিতান্ত উজ্‌বুক বলেই ওটাকে আলাদা করে রেখেছে।

দেবু পকেট থেকে একমুঠো জাম বার কর্‌ল—তাই না দেখে বেঁটে ভালুকটার লম্ফ-ঝম্ফ দেখে কে? কিন্তু আমরা প্রথমে দিলাম মোটা ভালুকদের, তারা দু'-একটা চাখ্‌ল মাত্র, তারপর আর ছুঁলও না। এই ভালুক দু'টোর টেষ্ট উঁচুদরের বল্‌তে হবে, কেননা আমরাও রাস্তায় চেখে দেখেছি জামগুলো একেবারে অখাদ্য, এমন বিশ্রী জঘন্য জাম প্রায় দেখা যায় না।

কিন্তু বেঁটে ভালুকটা তাই অম্লানবদনে সবগুলো খেল; খেয়ে আবার হাত বাড়ায়! দেবু দু'পকেট উল্‌টিয়ে জানায়

যে 'হোপ্‌লেস্', তবু তার আগ্রহের নিবৃত্তি হয় না। বুঝলাম ব্যাটার বুদ্ধিশক্তি একটু কম।

দেবু আমার কাছে আবেদন করে,—"এই অমল, দে না তোর একটা চকোলেট একে।"

আমি অগত্যা বিরক্তিভরে একটা চকোলেট ছুঁড়ে দিই—"ভারী হ্যাংলা তো!"

দেবু মাথা নেড়ে জানায়, "ছেলেমানুষ কিনা! বড় হ'লে শুধ্‌রে যাবে।"

কিন্তু ভালুকটা চকোলেট স্পর্শও করে না, জামের জন্য দেবুর জামার নাগাল পাবার চেষ্টা করে। আমি এয়ার্-গানের সাহায্যে চকোলেটটা সন্তর্পণে বাগিয়ে এনে বদন ব্যাদান করতেই দেবু বাধা দেয়, "খাস্ নে, সেপ্‌টিক্ হবে।"

বাধ্য হ'য়ে চকোলেটটা মোটা ভালুকদের দান করতে হয়। যথার্থই ওদের টেষ্ট উঁচুদরের। ওদের একজন ওটা সযত্নে কুড়িয়ে নেয়, নিয়ে সুকৌশলে রূপালী কাগজের মোড়ক খুলে ফেলে চকোলেটটা বার করে, তারপরে সমান দু' ভাগ ক'রে দু'জনে মুখে পূরে দেয়। ভালুকদের মধ্যে এরূপ সভ্যতা আর সাধুতা আমি কোনদিন আশা করিনি। একদম্ অবাক্ হ'য়ে যাই। এ রকম ন্যায়পরায়ণ আদর্শ ভালুককে মারাটা সঙ্গত হবে কিনা এয়ার্-গান্ হাতে নিয়ে ভাব্‌তে থাকি।

দেবু চমৎকৃত হয়—"দেখ্‌ছিস্‌ কি রকম শিক্ষিত ভালুক!" তারপরে একটু থেমে যোগ করে—"শিক্ষিত প্রাণীদের শিকার করা কি উচিত?" অবশেষে আমার মতামত না পেয়েই আপন মনে ঘাড় নাড়তে থাকে—"একেই তো আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা কম ;...এই ভালুকটি গেলে এর স্থান কি আর পূর্ণ হবে?"

ওর সহৃদয়তার প্রশ্রয় না দিয়ে গম্ভীরভাবে জবাব দিই—"না, এখন আর শিকার করব না। সার্কাস্‌ দেখ্‌বার আগে এদের খতম্‌ করা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না।"

আড়াইটার শো-র টিকিট কেটে আমি আর দেবু ঢুকে পড়ি—আমার হাতে দেবুর এয়ার-গান্‌, আর দেবুর হাতে আমার ক্যামেরা। স্থিরসংকল্প হয়েই ঢুকেছি, সার্কাসের পরেই অব্যর্থ শিকার ; কেননা অনেক ভেবে দেখ্‌লাম, সার্কাস্‌-এর সঙ্গে কার্‌কাস্‌-ই হচ্ছে একমাত্র মিল্‌ এবং খুব ভালো মিল্‌। শিকারী-জগতে ভয়ানক পেচিয়ে রয়েছি অন্ততঃ আমার পিস্তুতো দাদা এবং তাঁর মাস্তুতো বড়দা'র চেয়ে ত বটেই,—সেই অপবাদ আজ দূর করতে হবে।

প্রথমেই সেই মোটা ভালুক দু'টোকে এরীনায় এনে হাজির করেছে। বেঁটেটাকে ওদের সঙ্গে না দেখে দেবু একটু ক্ষুণ্ণ হ'ল—"সেই বাচ্চাটাকে আন্‌বে না?"

"ওটা আস্ত জানোয়ারই আছে, এখনো মানুষ হ'য়ে ওঠেনি কিনা!"

দেবু চুপ্ করে থাকে, বোধ করি ওর প্রাণের ভালুককে অমানুষ বলাতে মনে মনে দুঃখিত হয়। খানিক বাদে ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বলে, "হতভাগার জন্যে জাম এনেছিলাম।"

আমি ওর দিকে আশ্চর্য্য হ'য়ে তাকাই—"য়্যাঁ? তোরও বুঝি ভালুক-শিকারের মতলব? একরাশ ওই বিদ্‌ঘুটে জাম খেয়ে কেউ বাঁচে কখনও? পেটে গেছে কি নির্ঘাৎ ধনুষ্টঙ্কার! তুই বুঝি জাম খাইয়ে কাজ সারতে চাস্?" দেবু উত্তর দেয় না। আমি আশ্বাস দিই—"তা বেশ ত, এয়ার্-গানে ঐ জাম পূরে ছুঁড়লে নেহাৎ মন্দ হবে না। জাম খাওয়ানোকে জাম খাওয়ানো, কাম ফতেকে কাম ফতে!"

দেবু সান্ত্বনা পায় কিনা ও-ই জানে। দেখি ওর দু' পকেট জামে ভর্ত্তি। ইতিমধ্যে সেই মোটা ভালুক দু'টো বাইসিকেলে চেপে এমন সব অদ্ভুত কসরৎ দেখাতে থাকে যা নিজের চোখে দেখ্‌লেও বিশ্বাস করা যায় না। ভালুকের ভাষা আলাদা না হ'লে এবং আলাপের সুবিধা থাক্‌লে, ওদের কাছ থেকে দু'-একটা সাইকেলের প্যাঁচ্ শিখে নিলে নেহাৎ মন্দ হ'ত না। সেটা সম্ভব কিনা মনে মনে চিন্তা করছি, এমন সময়ে দেবু

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে—"আমার সেজ মামা কি বলে জানিস্ অমল ?"
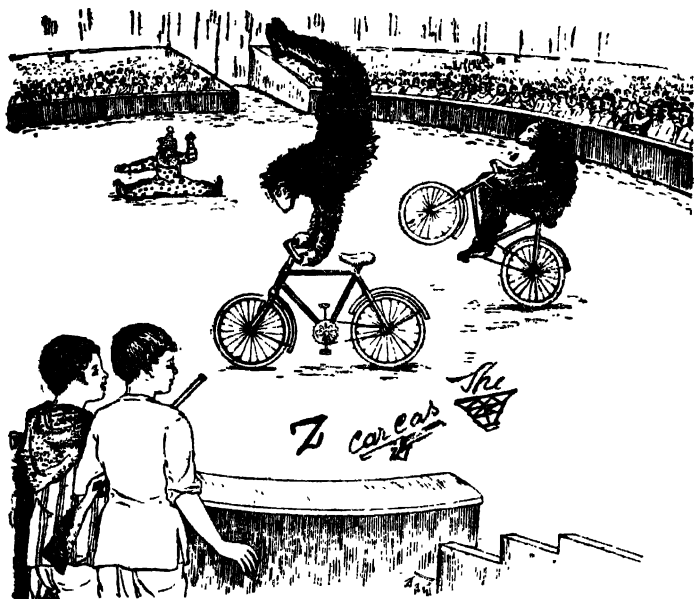
মোটা ভালুক দু'টো বাইসিকেলে চেপে অদ্ভুত কসরৎ দেখাচ্ছে।

দেবুর সেজ মামা কি বলে জান্‌বার আগ্রহ না থাক্‌লেও জিজ্ঞাসা করি।—"বলে, যে সার্কাসে মানুষে ভালুকের খোলস্ গায়ে দিয়ে সেজে থাকে। সাইকেলের খেলা দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে।"

আমি প্রতিবাদ করি—"পাগল! আমি কখনো কোনো মানুষকে এমন অদ্ভুত সাইকেল চালাতে দেখিনি, এ কেবল ভালুকের পক্ষেই সম্ভব।"

দেবু ঘাড় নাড়ে—"তা বটে।"

আমি জোর দিয়ে বলি—"নিশ্চয়ই তাই! শিক্ষালাভের ফলে কত কি হয় বইয়ে পড়িস্‌নি? এ তো কিছুই না, আমি যদি ভালুকটাকে তারের ওপর সাইকেল্‌ চালাতে দেখি তাহ'লেও আশ্চর্য্য হব না। এমন কি এখুনি যদি ওরা স্পষ্ট বাংলায় কথা কইতে সুরু করে দেয় তাহ'লেও না।"

দেবু সায় দেয়—"হুঁ, তা বটে।"

কায়দা-কসরৎ দেখিয়ে ভালুকেরা চলে গেল। একটু পরে, যখন একটা হাতী চার পায়ে একটা পিপের পিঠে দাঁড়াবার দুশ্চেষ্টায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হচ্ছে—আমি দেবুকে অপেক্ষা করতে ব'লে, অলক্ষ্যে ওদের অনুসরণ করলাম। দেখলাম এখন হাতীর কসরতের ওপরেই সকলের যারপরনাই মনোযোগ, ভালুক-শিকারের এই হচ্ছে সুযোগ।

সার্কাসের পেছন দিক্‌ দিয়ে মিনেজারীর পাশ ঘেঁষে একেবারে তাঁবুর শেষ প্রান্তে ভালুকের আস্তানা! দূর থেকে মনে হ'ল ভালুক দুটো যেন নিজেদের বাহাদুরির গল্প ফেঁদেছে। বেশ স্পষ্ট দেখ্‌লাম ধেড়ে-মোটাটা পিঠ চাপ্‌ড়ে ছোট ভাইকে

সাবাস্ দিচ্ছে। ওরা কি ভাষায় কথোপকথন করে জান্‌বার কৌতূহল ছিল কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পাবামাত্র যেন একদম্ বোবা মেরে গেল।

আমি বল্লাম, "কি হে ভায়ারা! বেশ ত আড্ডা চল্‌ছিল, থাম্‌লে কেন?"

আমার কথা শুনে এ ওর মুখের দিকে তাকাল, তার মানে —'এই ছেলেটা কি বল্‌ছে হ্যা?' নিশ্চয়ই আমাদের বুলি ওদের বোধগম্য নয়। উঁহু, স্বদেশী ভালুক না; তবে কি উত্তর মেরুর, যাকে 'পোলার বেয়ার' বলে, তাই নাকি এরা? পোলার বেয়ার মারতে পারলে বড়দা'র চেয়ে বড় কীর্ত্তি রাখ্‌তে পার্‌ব ভেবে মনে ভারী স্ফূর্ত্তি হ'ল। এয়ার্-গান্‌টা বাগিয়ে ধরলাম।

প্রথমে বাচ্চা থেকেই সুরু করা যাক্, কিন্তু খাঁচার পাখী শিকার ক'রে আরাম নেই। বেঁটে ভালুকটার খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। বিপদ্ এবং মুক্তি, এক কথায় বিপন্মুক্তির সম্মুখীন হয়ে ও যেন প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। কেননা অনেক ইতস্ততঃ ক'রে তবে সে খাঁচার নীচে পা বাড়াল।

এমন সময়ে একটা অঘটন ঘট্‌ল। অকস্মাৎ দৈববাণী হ'ল —"পালাও পালাও, মারাত্মক ভালুক।"

চারি দিকে তাকালাম, কেউ কোথাও নেই, সার্কাসের লোকজন সার্কাস নিয়ে ব্যস্ত, তবে এ কার কণ্ঠধ্বনি ? নিজের স্বগতোক্তি বলেও সন্দেহ করবার কারণ ছিল না। ভাল ক'রে চেয়ে দেখি, ওমা, সেই মোটা ভালুকদেরই একজন হাত নাড়ছে আর ওই কথা বল্‌ছে।

আগেই আঁচ করা ছিল তাই আর আশ্চর্য্য হলাম না ; বাংলাভাষাও যে এরা আয়ত্ত করেছে এই ধরণের একটা সন্দেহ আমার গোড়া থেকেই ছিল। শিক্ষিত ভালুকের পক্ষে একটা বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করা এমন আর বেশী কথা কি ? ইতিমধ্যে সেই বেঁটে ভালুকটা দেখি আমার বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে এসে পড়েছে।

মোটা ভালুকটা আবার আওয়াজ ছেড়েছে—"ওহে দেখ্‌ছ না ! ভালুক যে !"

ভালুক যে, তা অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি। ভালুক আমি খুব চিনি। চিনি এবং নিজেকেও চেনাতে জানি—আমি এবং আমার দাদা দু'জনেই। কিন্তু এই মোটা ভালুকটার আহাম্মুকি দেখ ! একটু শিক্ষা পেটে পড়েছে কি আর অহঙ্কারের সীমা নেই, অম্‌নি নিজের জাত ভুল্‌তে সুরু করেছেন। কোন কোন বাঙালী যেমন দু'পাতা ইংরিজি পড়েই নিজেকে আর বাঙালী জ্ঞান করে না, একেবারে খাস্‌ ইংরেজ ভেবে

বসে, ওরও তাই দশা হয়েছে। নিজেও যে উনি একটি 'নাথিং বাট্ ভাল্লুক' তা ওঁর খেয়ালই নেই।

ভারী রাগ হয়ে গেল আমার। চেঁচিয়ে বল্লাম—"ও তো ভাল্লুক, আর তুমি কি ? তুমি যে আস্ত একটা জাম্বুবান !"

ওকে একটু লজ্জা দেবার চেষ্টা করলাম, এ রকম না দিলে চলে না। শিক্ষিত লোককেও অনেক সময়ে শিক্ষা দেবার দরকার হয়। আমার অত্যুক্তি শুনে বোধ করি ভালুকটার আত্মগ্লানি হ'ল, কেননা সে আর উচ্চবাচ্য কর্‌ল না। বেঁটেটা আর এক পা এগুতেই আমি এয়ার-গান্ ছুঁড়লাম, ছর্‌রাটা ওর পেটে গিয়ে লাগ্‌ল। ও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পেটটা একবার চুল্‌কে নিল কিন্তু মোটেই দম্‌ল না, ধীরপদে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল—বন্দুকের মুখেই।

দুঃসাহসী বটে ! বাধ্য হয়ে এবার আমাকেই পশ্চাদ্‌পদ হ'তে হ'ল। "আবার আবার সেই কামান গর্জ্জন।" কিন্তু ও একটু করে গা চুলকায় আর এগিয়ে আসে। গ্রাহ্যই করে না, যেন অনেক কালের গুলি খাবার অভ্যাস !

বুঝলাম খুব শক্ত শিকারের পাল্লায় পড়া গেছে, আমার বড়দা'র বরাতে যা জুটেছিল, ইনি মোটেই তেমন সন্তোষজনক হবেন না। হঠাৎ উনি একটা অদ্ভুত গর্জ্জন করলেন ; ওটা বাংলার কোনো অব্যয় শব্দ কিংবা কোনো অপভাষা কিনা মনে

মনে এইরূপ আলোচনা করছি এবং যখন প্রায় সিদ্ধান্ত ক'রে ফেলেছি যে ওই গর্জ্জনের ভাষাটা বাংলা নয় বরং গ্রীক্ হ'লেও হ'তে পারে, সেই সময়ে ভালুকটা অভদ্রের মত দৌড়ে এসে অকস্মাৎ আমাকে এক দারুণ চপেটাঘাত করল।

স-বন্দুক আমি বিশ হাত দূরে ছিট্‌কে পড়লাম। জানোয়ার-দের খাবার জন্য কি শোবার জন্য জানি না বিচালির গাদা স্তূপাকার করা ছিল তার ওপরে গিয়ে পড়েছিলাম বলেই বাঁচোয়া। এক মুহূর্ত্তের চিন্তাতেই বুঝলাম যে গতিক সুবিধের নয়। যে পালায় সেই কীর্ত্তি রাখে এবং যে কীর্ত্তি রাখ্‌তে পারে কেবল সেই বেঁচে যায়, এমন কথা নাকি শাস্ত্রে বলে। আজ যদি শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করি, তাহ'লে কাল ফিরে এসে শিকার আবার করলেও করতে পারি। অতএব—

চড়্‌টা আমার পালানোর পক্ষে সাহায্যই করল, না হেঁটে না হটে এবং না লাফিয়ে বিশ হাত এগিয়ে পড়া কম কথা নয়! উঠেই উদার পৃথিবীর দিকে চোঁচা দৌড় দিলাম। ভালুক বাবাজীবনও অম্‌নি পিছু নিলেন—যেমন ওদের দুঃস্বভাব। অনুকরণ আর অনুসরণ করতে যে ওরা ভারী মজবুত দাদার গল্প পড়েই তা আমার জানা ছিল।

পাহাড়ের যে দিক্‌টায় আলেয়ার ভয়ে দিনেও লোকে পথ হাঁটে না, প্রাণভয়ে সেইদিকেই ছুট্‌লাম। মাঝখানে একটা

জায়গা এমন স্যাঁৎসেতে, সেখান দিয়ে যেতে কি রকম একটা গ্যাসে যেন দম্ আট্‌কে আসে ; জায়গাটা পেরিয়ে উঁচু একটা পাথরের ঢিবিতে দাঁড়িয়ে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচি।

দৌড়তে দৌড়তে ভালুকটা সেই স্যাঁৎসেতে জায়গাটায় এসে পিছ্‌লে পড়্‌ল। মিনিটখানেক পরে উঠ্‌তে গিয়ে আবার মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে গেল। হঠাৎ কি হ'ল ভালুকটার ? বার বার চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই যেন আর দাঁড়াতে পারে না।

আমিও সেই উঁচু ঢিবিটার উপরে দাঁড়িয়ে—অনেকক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ দেখি ভালুকটা উঁচু হয়েছে, উঠেই দাঁড়িয়েছে কিন্তু মাথার দিকে নয় লেজের দিকে ! অবাক্ কাণ্ড ! মাথা নীচের দিকে, লেজ ওপরের দিকে—এ আবার কি রে ! এটা কি এখানেই সার্কাস্ সুরু কর্‌ল নাকি !

আরো খানিকক্ষণ কাট্‌ল। ভালুকটা আরো একটু উঁচু হ'ল। ভাল ক'রে চোখ রগ্‌ড়ে দেখি—ও দাদা, এ যে একেবারে মাটি ছেড়ে উঠে পড়েছে ! দাঁড়িয়েই আছে বল্‌তে হবে, যদিও তার মাথাই নীচে আর পা উপরের দিকে। ভালুকটা দু'হাত দিয়ে মাটি আঁক্‌ড়াবার প্রাণান্ত চেষ্টা করছে, কিন্তু তার আকাশে পদাঘাত করাই সার—কেননা পৃথিবী আর তার মধ্যে তখন দু'হাত ফারাক্ ! মাটির নাগাল্ পাওয়া মুস্কিল !

খানিক বাদে ভালুকটা উড়তে সুরু করল। ভালুক উড়ছে এ কখনও কল্পনা করতে পার? কিন্তু আমার স্বচক্ষে দেখা। আমার হাত থেকে এয়ার-গান্ খসে পড়ল। উড়তে উড়তে ভালুকটা একবার আমার মাথার কাছাকাছি পর্য্যন্ত এল—আমি বসে পড়ে আত্মরক্ষা করলাম। ও যে রকম হাত বাড়িয়েছিল, ঠিক ডুবন্ত লোক যে ভাবে কুটো ধরতে যায়,—আর একটু হ'লেই আমায় ধরে ফেলেছিল আর কি! ওর চোখে এক অসহায় সপ্রশ্ন দৃষ্টি—ভাবটা যেন, 'হায়, আমার একি হ'ল!' আমাকে ধরতে ওকে সাহায্য না করায়, ও যে আমার ওপর খুব বিরক্ত আর মর্ম্মাহত হয়েছে, তা ওর মুখভাব দেখলেই বোঝা যায়।

লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ওর পেটটা ভয়ানক ফেঁপে উঠেছে—চারটে জয়ঢাক এক করলে যা হয়। ঠিক যেন একটা রক্ত-মাংসের বেলুন্! ভালুকটা ক্রমশঃই উপরের দিকে যেতে লাগ্ল—লেজ সর্ব্বাগ্রে। দেখতে দেখতে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে অবশেষে বিন্দুমাত্রে পরিণত হ'ল, তারপর চক্ষের পলকে অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

অমল-ভ্রাতাজীবনের শিকার-কাহিনী পাঠে বিজ্ঞানবিদ্

পাঠক হয়ত এই ব্যাখ্যা দেবেন যে, বেচারা ভালুক যে স্যাঁৎসেতে জায়গায় হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে, সেখানটায় প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাদুর্ভাব ছিল; সেই গ্যাস্ উদরস্থ করার ফলেই বাবাজী বেলুনে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার বিশ্বাস ওই ভালুকটা ছিল অতিরিক্ত পুণ্যাত্মা—কেননা সশরীরে স্বর্গারোহণের সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়! এ ভাবে মহাপ্রস্থানের পথে যাবার য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ এ পর্য্যন্ত চারজনের মোটে হয়েছে, এই ভালুক-নন্দনকে ধ'রে; যার মধ্যে কেবল একজন মাত্র দুর্ব্বিপাক কাটিয়ে কোন গতিকে স্বস্থানে ফিরতে পেরেছেন। প্রথম গেছলেন স্বয়ং যুধিষ্ঠির, দ্বিতীয়—তাঁরই সমভিব্যাহারী জনৈক কুকুর-শাবক, তৃতীয় আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, আর চতুর্থ— ?

চতুর্থ এঁদের কারো চেয়েই কোন অংশে ন্যূন নয়।

হরগোবিন্দর যোগ-ফল * *

কঞ্জিভেরম্ থেকে ঘুরে এসে আমাদের পাড়ার হরগোবিন্দ মজুমদার কেবল তাল্ ঠুক্‌তে লাগ্‌লেন—"বলং বলং যোগবলম্! বলযোগে কিছু হবে না, যদি কিছু হয় তো যোগবলে।"

আমাদের সন্দেহ হোলো, ভদ্রলোক বোধ হয় শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে গেছলেন এবং সেখান থেকে মাথা খারাপ করে' রাঁচী না হয়েই বাড়ী ফিরেচেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কঞ্জিভেরম্‌টা কোথায় দাদা?"

"কঞ্জিভেরম্ কোথায় জানিস্‌নে? কোথাকার ভেড়া! জিওগ্রাফি অপ্‌শনাল্ ছিল না বুঝি? অ! কঞ্জিভেরম্ হোলো পণ্ডিচেরমের কাছাকাছিই।"

"পণ্ডিচেরম্! সে আবার কোথায়?" বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যাই।

তিনি ততোধিক অবাক হন—"কেন? আমাদের অরবিন্দর

আস্তানা! পণ্ডিচেরম্-এর বাংলা করলেই হবে পণ্ডিচারী। আসলে ওটা তেলেগু ভাষা কিনা!" একটু থেমে আবার বলেন, "তেমনি কঞ্জিভেরমের বাংলা হোলো কঞ্চি ভারী, মানে বাঁশের চেয়েও।"

"ওঃ, বোঝা গেছে! পণ্ডিচারী না গিয়েই তুমি পিণ্ডচারী, মানে কিনা, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েচ? তাই বলো এতক্ষণ!"

"তোরা বুঝ্‌বিনে। এ সব বুঝতে হলে ভাগবৎ মাথা চাই রে, মানুষের মাথার কর্ম্ম নয়। যোগবল দরকার।" তিনি হতাশভাবে মাথা নাড়েন।

আমি তার চেয়ে বেশি মাথা নাড়ি—"যা বলেছ দাদা! আমাদেরই মুণ্ডুগেরম্, অর্থাৎ মুণ্ডুর, কিনা, কপালের গেরো।"

বাড়ীর চিল্‌কোঠায় বসে দাদার যোগাভ্যাসের বহর চলে, পাড়ার চা-খানায় বসে' আমরা তার আঁচ পাই। একদিন খবর যা এল তা যেমন অদ্ভুত তেমনি অভূতপূর্ব্ব। দাদা নাকি যোগবলে মাধ্যাকর্ষণকেও টেক্কা মেরেছেন—আসন-পিঁড়ি অবস্থায় নাকি আড়াই আঙুল মাটি ছাড়িয়ে উঠেছেন।

আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি, এ কখনো হতে পারে? উঁহু! অসম্ভব!

কিন্তু সংবাদদাতা শপথ করে' বলে (তার বিশ্বস্ত সূত্রকে টেনে ছেঁড়া যায় না) যে তার নিজের চোখে দেখা, দাদার তলা

থেকে পিঁড়ি টেনে নেওয়া হোলো কিন্তু দাদা যেমনকার তেমনি বসে থাক্‌লেন যেখানকার সেখানে—যেন তথৈবচ!

আমি প্রশ্ন করি, চোখ বুজে বসে' ছিলেন কি?

উত্তর আসে—"আলবৎ! যোগে যে চোখ বুজ্‌তে হয়।"

আমি বলি, "তবেই হয়েচে! চোখ বুজে ছিলেন বলেই পিঁড়ি সরানো দেখ্‌তে পান্ নি, নইলে ধুপ্ করে' মাটিতে বসে পড়তেন।"

ভরত চাটুজ্যে যোগ দেয়—"নিশ্চয়ই! হাত পা গুটিয়ে আকাশে বসে' থাকা কি কম কষ্ট রে দাদা! অম্‌নি করে' মাটিতে বসে' থাকৃতেই হাতে পায়ে খিল্ ধরে' যায়!"

তার পরদিন খবর এল, আজ আর আড়াই আঙুল নয়, প্রায় ইঞ্চি আড়াই। তার পরদিন আধ হাত, তারপর ক্রমশ এক হাত, দেড় হাত, পৌনে দুই,—অবশেষে যেদিন আড়াই হাতের খবর এল সেদিন আর আমি স্থির থাক্‌তে পারলাম না, পৃথিবীর নবম আশ্চর্য্য (কেননা, অষ্টম আশ্চর্য্য অনেকগুলো ইতিমধ্যে ঘোষণা হয়ে গেছে) হরগোবিন্দ মজুমদার-দর্শনে উর্দ্ধশ্বাস হলাম।

কিন্তু গিয়েই জান্‌লাম তার একটু আগেই তিনি নেমে পড়েছেন।—ভারি হতাশ হলাম। কি করব? কান থাক্‌লেই শোনা সম্ভব,—কিন্তু দেখার আলাদা ভাগ্য থাকা চাই। ভূত,

ভগবান, রাঁচীর পাগ্‌লা গারদ, বিলেত-জায়গা—এ সব অনেক কিছুই আছে বলে' শোনা যায়, কিন্তু কেবল ভাগ্যে থাক্‌লেই দর্শন মেলে। আমার চক্ষু-ভাগ্য নেই করব কি ?

"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত", ইত্যাদি আবেদনে আড়াই হাত আত্মোন্নতির জন্য হরগোবিন্দকে পুনরায় উদ্বুদ্ধ করব কিনা এই কথা ভাব্‌ছি, এমন সময়ে দাদা আমার ইতস্ততঃ-চিন্তায় অকস্মাৎ বাধা দিলেন—"তোরা আর আমাকে হরগোবিন্দবাবু বলিস্‌নে।"

"তবে কি বল্‌ব ?"

"হরগোবিন্দ মজুম্‌দারও না।"

"তবে ?"

তিনি আরম্ভ করেন—"যেমন শ্রীভগবান, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র—"

আমি যোগ করি—"শ্রীমদ্ভাগবৎ, শ্রীহনুমান—"

"উঁহু, হনুমান্ বাদ। যেমন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ—"

আমি থাক্‌তে পারি না, বলে' ফেলি—"শ্রীত্রৈলঙ্গস্বামী, শ্রীঅরবিন্দ—"

"হুঁ, এবার ঠিক বলেছিস্। তেমনি আজ থেকে আমি, তোরা মনে করে' রাখিস্, আজ থেকে আমি শ্রীহরগোবিন্দ।"

আমি সমস্ত ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করি, সত্যি তাইত হবে, ব্যাঙাচি বড় হয়ে ব্যাঙ্ হলে' তার ল্যাজ্ নোটিশ্ না দিয়েই খসে যায়, তেমনি যে-মানুষ আড়াই হাত মাটি ছাড়িয়েছে সে তো আর সাধারণ মানুষ নয়, তারও ল্যাজামুড়ো যে বিনা বাক্যব্যয়ে লোপ পাবে সে আর আশ্চর্য্য কি !

আমি সবিনয়ে বলি—"এতটাই যখন ত্যাগস্বীকার করলেন দাদা, তখন নামের মধ্যে থেকে ওই বদ্‌খৎ গো-কথাটাও ছেঁটে দিন্। ওতে ভারি ছন্দপাত হচ্ছে। নইলে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে শ্রীহরবিন্দ বেশ মিলে যায়।"

দাদাকে কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত দেখি—"ব্যাকরণে লুপ্ত অ-কার হয় জানি। কিন্তু গো-কার কি লুপ্ত হবার ?" তাঁর বিচলিত দৃষ্টি আমার উপর বিন্যস্ত হয়।

আমি জোর দিই—"একেবারে লুপ্ত না হোক্, ওকে গুপ্ত রাখাও যায় তো ? চেষ্টা করলে না হয় কি !"

দাদা অমায়িক হাস্য করেন—"পাগল ! যোগদৃষ্টি থাক্‌লে দেখ্‌তে পেতিস্ যে গুরু-মাত্রের মধ্যেই গোরু প্রচ্ছন্ন রয়েচেন, গোরুর জন্য যেমন শস্য, গুরুর জন্য তেমনি শিষ্য—আড়ম্বরের ইতর-বিশেষ কেবল ! আসলে উভয়েরই হোলো গিয়ে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। সুতরাং গো-কথাটায় আপত্তি করবার এমন

কি আছে ?" তারপর দম নেবার জন্য একটু থামেন, "তা ছাড়া গো-শব্দে নানার্থ! অভিধান খুলে ছাখ্।"

আমি কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিলাম, উনি বাধা দেন—"এ নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোকে। তোর যখন ভাগবৎ মাথা নয়, তখন ও-মাথা আর ঘামাস্‌নে। তুই বরং ভরতকে ততক্ষণ ডেকে আন্। ওকে আমার দরকার।"

ভরতচন্দ্র আস্‌তেই দাদা সুরু করেন—"বৎস, তোমার লেখা-টেখা আসে নাকি ? এই রকম যেন কানে এসেছিল।"

"লিখি বটে এক-আধটু, সে-কিন্তু কিছু হয় না।"

"আরে সাহিত্য না হোক্, কথা-শিল্প তো হয় ? তা হ'লেই হোলো। কথা-শিল্প আর কাঁথা-শিল্প এই দুটোই তো আমাদের জাতীয় সম্পদ, বল্‌তে গেলে—আর কি আছে ?" সহসা আত্ম-প্রসাদের ভারে দাদা কাতর হয়ে পড়েন, "ভরত, তোমাকেই আমার বাহন করব, বুঝলে ? তুমিই আমার মহিমা প্রচার করবে জগতে। কিন্তু দেখো, শ্রীভ-কথিত যেন সাত খণ্ডের কম না হয়। (আমার দিকে দৃক্‌পাৎ করে') তোদের কেনা চাই কিন্তু !"

আমি দাদাকে উৎসাহ দিই—"কিন্‌ব বইকি। আমরা না কিন্‌লে কে কিন্‌বে ?"

দাদা কিন্তু খিঁচিয়ে ওঠেন—"কে কিন্‌বে! দুনিয়া শুদ্ধু

কিন্‌বে! আর কেউ না কিনুক্ রোমা রোলাঁ কিন্‌বে একখান্!"
(তারপর একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে) ওই লোকটাই কেবল
চিন্‌ল আমাদের,—আর কেউ চিন্‌ল না রে!"

এম্‌নি চল্‌ছিল, এমন সময়ে দাদার যোগচর্চ্চার মাঝখানে
এক শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘট্‌ল। দাদা যোগবলে আড়াই হাত
ওঠেন, পোনে তিন হাত ওঠেন, তিন হাত ওঠেন, এম্‌নি ক্রমশ
চলে, হঠাৎ একদিন আকস্মিক সিদ্ধিলাভ করে' একেবারে
সাড়ে সাত হাত ঠেলে উঠেচেন! ফলে চিলকোঠার ছাদে
দারুণভাবে মাথা ঠুকে গেছে দাদার! ঘরখানা, দুর্ভাগ্যক্রমে,
সাড়ে পাঁচ হাতের বেশি লম্বা ছিল না।

কলিশনের আওয়াজ পেয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোক ওপরে গিয়ে
ছাখে, দাদা কড়িকাঠে লেগে রয়েছেন। মানে, মাথাটা সাঁটা,
উনি অবলীলাক্রমে ঝুল্‌চেন—চোখ বোজা, গা এলানো, ওটা
যোগ-সমাধি কি অজ্ঞান-অবস্থা, ঠিক বোঝা গেল না—দেখ্‌লে
মনে হয়, যেন কড়িকাঠকে বালিশ করে' আকাশের ওপর
আরাম করছেন।

ভাগবৎ মাথা বলেই রক্ষা, ছাতু হয়নি! অন্য কেউ হ'লে
ঐ ধাক্কায়, আপাদমস্তক চিঁড়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে একাকার হয়ে
যেত। যাই হোক্, দাদাকে তা বলে তো কড়িকাঠেই বরাবর
রেখে দেওয়া যায় না,—কিন্তু নামানোই বা যায় কি করে?

বাড়ীশুদ্ধ সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু কি করবে, ঘরের ছাদ সাধারণতঃ হাতের নাগালের মধ্যে নয়—বেশির ভাগ ছাদ এম্‌নি বে-কায়দায় তৈরি! অবশেষে একজন বুদ্ধি দিল, দাদার পায়ে দড়ির ফাঁস্‌ লাগিয়ে, কূপ থেকে জলের বাল্‌তি যেমন তোলে, তেম্‌নি করে' টেনে নামানো যাক্‌। অগত্যা তাই করা হোলো।

আমি যখন দাদার সান্নিধ্যে গেলাম,—যেমন শোনা তেম্‌নি ছোটা, কিন্তু ততক্ষণ দাদার পঙ্কোদ্ধার হয়ে গেছে—তখন দাদার মাথা আর বাড়ীর ছাদে নেই, নিতান্তই তুলোর বালিশে। হায় হায়, এমন চমকপ্রদ দৃশ্যটাও আমার চোখছাড়া হোলো, চক্ষুর অগোচরে একেবারেই মাঠে (মানে, কড়িকাঠে) মারা গেল—এম্‌নি দুরদৃষ্ট! হায় হায়!

চারিদিকের সহানুভবদের বাঁচিয়ে, বিছানার একপাশে সন্তর্পণে বস্‌লাম। মাথার জলপটিটা ভিজিয়ে নিয়ে দাদা বল্লেন—"ভায়া! এই জন্যই মুনি-ঋষিরা, বাড়ী-ঘর ছেড়ে, বনে-বাদাড়ে যোগসাধনা করতেন! কেননা ফাঁকা জায়গায় তো মাথার মার্‌ নেই। যত ইচ্ছা উঠে যাও,—গোলোক, ব্রহ্মলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, যদ্দূর খুসি চলে যাও, কোনো বাধা নেই—আকাশে এন্‌তার্‌ ফাঁকা! এই কথাই তো এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলুম ভরতচন্দ্রকে।"

ভরতচন্দ্র বাধিতভাবে ঘাড় নেড়ে নিজের বোধশক্তির পরিচয় দেন।

"আর এ কথাও বলি বাবা ভরতকে, যে কদাপি লেখার চর্চ্চা ছেড়ো না। ওটাও খুব বড় সাধনা। কালি-কলম-মন লেখে তিন জন—এটা কি একটা কম যোগ হোলো? আর যখন চাটুজ্যে হয়ে জন্মেচ তখন আশা আছে তোমার।"

আশান্বিত ভরত জিজ্ঞাসান্বিত হয়—"প্রভু, পরিষ্কার করে' বলুন! আমরা মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ—"

প্রভু পরিষ্কার করেন—"চাটুজ্যে হলেই লেখক হতে হবে, যেমন বঙ্কিম চাটুজ্যে, শরৎ চাটুজ্যে। আর লেখক হলেই নোবেল প্রাইজ্।"

"কিন্তু আমার লেখা যে নোবেল প্রাইজওলাদের লেখার দু' হাজার মাইলের মধ্যে দিয়ে যায় না, গুরুদেব! তেমন লিখ্‌তে না পারি, তেমন-তেমন লেখা বুঝতে তো পারি।"

"পারো, সত্যি?" গুরুদেব যেন সহসা ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, কিন্তু পরক্ষণেই কণ্ঠ সংযত করে' নেন্—"বাংলাদেশে কারই বা যায়? আর বিবেচনা করে দেখ্‌লে, তাদের লেখাও তো তোমাদের লেখার দু' হাজার মাইলের মধ্যে আসে না। তবে?"

আমি ভয়ে ভয়ে বলি—"তফাৎটা অতখানিই বটে, কিন্তু আগিয়ে কে, আর পিছিয়ে কে, সেই হোলো গে সমস্যা।"

দাদা অভয় দেন—"বৎস ভরত, ঘাব্‌ড়ে যেয়ো না। তুমি, নারান্ ভট্‌চাজ্ আর মেরী করেলী হ'লে এক গোত্র। পাবে, আলবৎ পাবে, নোবেল প্রাইজ পেতেই হবে তোমাকে। বিলেত যাবার উদ্‌যুগ কর তুমি। আমি শুনেছি, এদেশ থেকে এক-আধ ছত্র লিখ্‌তে-জানা কেউ বিলেত গেছে কি অম্‌নি তাকে ধরে' নিয়ে গিয়ে নোবেল প্রাইজ গছিয়ে দিয়েছে। প্রায় কালিঘাটে পাঁঠা বলি দেওয়ার মত আর কি!"

ভরতচন্দ্র উৎসাহ পায় কিনা তার মুখ দেখে ঠাহর হয় না। আমি কানে কানে বলি—"আরে, নাই বা পেলে নোবেল প্রাইজ! এই সুযোগে বিলেত দেখ্‌তে পাবে, অনেক সাহেব-মেম দর্শন হবে, সেইটাই কি কম লাভ? বরং এই ফাঁকে এক কাজ করো, বন্ধু-বান্ধব ভক্ত-টক্তদের মধ্যে বিলেত যাবার নামে চাঁদার খাতা খুলে ফেল, বোকা ঠকিয়ে যা দু' পাঁচ টাকা আসে। তারপর নাই বা গেলে বিলেত! তোমার আঙুল দিয়ে জল গলে না জানি, নইলে এই আইডিয়াটা দেবার জন্য টাকার বখ্‌রা চাইতাম।"

ভরতের মুখ একটু উজ্জ্বল হয় এবার।

তার বিলেত যাবার দিনে জাহাজঘাটে সে কি ভীড়! নোবেল-তলার যাত্রী দেখ্‌তে ছেলে বুড়ো সবাই যেন ভেঙে

পড়েছে। চিড়িয়াখানায় শ্বেতহস্তী দেখ্‌তেও এ রকম ভীড় হয়নি কোনোদিন। স্বয়ং শ্রীহরগোবিন্দ যখন বলেছেন, তখন নোবেল্‌প্রাইজ্‌ না হয়ে আর যায় না। যোগবাক্য কি মিথ্যে হবার? লেখার জোরে যদি নাই হয়—যোগবল ত একটা আছে, কি না হয় তাতে? ভরতচন্দ্র জাহাজে উঠ্‌তে গিয়ে পুলকের আতিশয্যে এক কুকুরের ঘাড়ে গিয়ে পড়েন।

কিম্বা হয়ত কুকুরই তাঁর ঘাড়ে পড়েছিল, কেননা কুকুরের হয়ে কুকুরের মালিক মার্জ্জনা চান্—"I am sorry, Babu!"

ভরতচন্দ্র জবাব দেন—"But I am glad—very glad!" আমার হাত টিপে ফিস্ ফিস্ করেন—"দেখ্‌ছিস্, সাহেবের কুকুর এসে ঘাড়ে পড়ছে। সাদা চাম্‌ড়ার লোক কাম্‌ড়ে না দিয়ে আপ্যায়িত করছে—এ কি কম কথা রে? নোবেল্‌প্রাইজ্‌ তো মেরেই দিয়েছি। কি বলিস্?"

আমি আর কি বল্‌ব! হয়ত কিছু বল্‌তে যাই, এমন সময় অকুস্থলে শ্রীশ্রীহরগোবিন্দর অভ্যুদয় হয়।

আশীর্ব্বাদের প্রত্যাশায় ভরতচন্দ্র ঘাড় হেঁট করেন। কিন্তু দাদার মুখ থেকে যা বেরয়, তা ঠিক আশীর্ব্বাণীর মত শোনায় না।

"বৎস, ফিরে চল, ফিরে চল আপন ঘরে। নোবেল্‌প্রাইজ্‌ তোমার জন্য নয়।"

শরতের আকাশে (কিম্বা ভরতের?) যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত! আমরা স্তম্ভিত, হতভম্ব, মুহ্যমান হয়ে পড়ি। এত আয়োজন, প্রয়োজন—সব পণ্ড তাহ'লে?

"বৎস, প্রথমে যোগবলে যা বলেছিলাম, তা ঠিক নয়। তা ছাড়া সেদিন আমার ভাগবৎ মাথার অবস্থা ভালো ছিল না—ভাগবৎ যোগের সঙ্গে কড়িকাঠ যোগ ঘটে ছিল কিনা! আজ সকালে আবার নতুন করে' যোগ কষ্‌লাম, সেই যোগফলই তোমাকে জানাচ্ছি।"

ফুঁ দিয়ে বাতি নিবিয়ে দিলে ঘরের চেহারা যেমন হয়, ভরতচন্দ্রের মুখখানা ঠিক তেমনি হয়ে গেল (উপমাটা বাজার-চল্‌তি চতুর্থ শ্রেণীর উপন্যাস থেকে চুরি করা—সেই মুখভাবের হুবহুব্ বর্ণনা দেবার জন্যই, অবশ্য!)

হরগোবিন্দর বাণীবর্ষণ চল্‌তে থাকে: "বৎস, সব যোগের চেয়ে বড় যোগ কি, জানো? রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ, মনোযোগ, অর্দ্ধোদয়যোগ—সব যোগের সেরা হচ্ছে যোগাযোগ। এই যোগাযোগ ঘট্‌লেই, তার চেয়েও বড়ো, বল্‌তে গেলে শ্রেষ্ঠতম যোগের প্রকাশ আমরা দেখ্‌তে পাই, তা হচ্চে অর্থযোগ। এবং তা না ঘট্‌লেই বুঝতে পারছ যাকে বলে অনর্থযোগ। রবীন্দ্রনাথের বেলা এই যোগাযোগ ছিল তাই তাঁর নোবেল্‌প্রাইজ্ জুটেছে, তোমার বেলা তা

নেই। কি করে' আমি এই যোগফলে এলাম, তোমরাও তা' কষে দেখ্‌তে পারো। রবীন্দ্রনাথ+পাকা দাড়ি+টাকার থলি=নোবেল্‌প্রাইজ্‌। কিন্তু তোমার পাকা দাড়িও নেই, টাকাকড়িও নেই—বৎস ভরতচন্দ্র, সে যোগাযোগ তোমার কই ?

ভরতচন্দ্রের করুণ কণ্ঠ শোনা যায়—"কিছু টাকা আমিও যোগাড় করেছি। আর দাড়ির কথা যদি বলেন, না হয় আমি পর্‌চুলার মত একটা পর্‌দাড়ি লাগিয়ে নেব।"

শ্রীহরগোবিন্দ প্রস্তাবটা পর্য্যালোচনা করেন, কিন্তু পরক্ষণেই দারুণ সংশয়ে তাঁর মুখ-চোখ ছেয়ে যায়—"কিন্তু তারা যদি প্রাইজ্‌ দেবার আগে টেনে ছাখে, তখন ?"

সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা আমার মনেও সাড়া তোলে। সত্যিই তো, তখন ? ভরতচন্দ্রও বারবার শিউরে ওঠেন।

"নাঃ, সে কথাই নয়। ভরতচন্দ্র তুমি মর্ম্মাহত হয়ো না। যেমন half a loaf is better than no-loaf তেম্‌নি half a বেল্‌ is better than নোবেল্‌। তোমার জন্য আমি প্রাইজ্‌ এনেছি, তা নোবেলের চেয়ে বিশেষ কম যায় না। বিবেচনা করে' দেখ্‌লে অনেকাংশে ভালোই বরং। বৎস, এই নাও।"

বলে' কাগজে-মোড়া একটা প্যাকেট্ ভরতচন্দ্রের হাতে দিয়ে, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে' ভিড়ের মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হন: আমরা প্যাকেট্ খুল্‌তে থাকি, মোড়কের পর মোড়ক খুলেই চলি, কিন্তু মোড়া আর ফুরায় না। অবশেষে অভ্যন্তরীণ বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করে।

আর কিছু না, একটা কদ্‌বেল্।

পরোপকারের বিপদ ❀ ❀

আমার বন্ধু নিরঞ্জন ছোটবেলা থেকেই বিশ্বহিতৈষী—ইংরেজীতে যাকে বলে ফিলান্‌থ্রপিস্ট্‌। এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়্‌তে ওর ফিলান্‌থ্রপিজ্‌মের অনেক ধাক্কা আমাদের সইতে হয়েছে। নানা সুযোগে ও দুর্য্যোগে ও আমাদের হিত করবেই, একেবারে বদ্ধপরিকর—আমরাও কিছুতেই দেব না ওকে হিত করতে। অবশেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করে', অনেক কষ্টে, হয়ত ওর হিতৈষিতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছি।

হয়ত ফুটবল্‌ ম্যাচ্‌ জিতেছি, সাম্‌নে এক ঝুড়ি লেমোনেড্‌, দারুণ তেষ্টাও এদিকে—ও কিন্তু কিছুতেই দেবে না জল খেতে, বলেছে, "এত পরিশ্রমের পর জল খেলে হার্টফেল্‌ কর্‌বে।"

আমরা বলেছি, "করে করুক তোমার তাতে কি?"

—"আহা, মারা যাবে যে।"

—"জল না খেলেও যে মারা যাবো, দেখছ না।"

সে গম্ভীর মুখে উত্তর দিয়েছে—"সেও ভালো।"

তখন ইচ্ছা হয়েছে আরেকবার ম্যাচ্ খেলা সুরু করি—নিরঞ্জনকেই ফুটবল্ বানিয়ে। কিম্বা ওকে ক্রিকেটের বল্ ভেবে নিয়ে লেমোনেডের বোতলগুলোকে ব্যাটের মত ব্যবহার করা যাক্।

পরের উপকার করবার বাতিকে নিজের উপকার করার সময় পেত না ও। নিজের উপকারের দিকটা দেখতেই পেত না বুঝি। এক দারুণ গ্রীষ্মের শনিবারে হাফ্-স্কুলের পর মাঠের ধার দিয়ে বাড়ী ফিরছি, নিরঞ্জন বলে উঠ্ল—"দেখ্ছ, হিরণ্যাক্ষ, দেখতে পাচ্ছ ?"

কী আবার দেখ্ব ? সাম্নে ধূ ধূ করছে মাঠ, একটা রাখাল গরু চরাচ্ছে, দু'-একটা কাক-চিল এদিক ওদিকে উড়ছে হয়ত—এ ছাড়া আর কোনো দ্রষ্টব্য পৃথিবীতে দেখতে পেলাম না। ভালো করে আকাশটা লক্ষ্য করে নিয়ে বল্লাম—"হ্যাঁ দেখেছি, এক ফোঁটাও মেঘ নেই কোথ্থাও। শীগ্গীর যে বৃষ্টি নাম্বে সে ভরসা করি না।"

—"ধ্যুত্তোর মেঘ! আমি কি মেঘ দেখতে বলেছি তোমায়। ওই যে রাখালটা গরু চরাচ্ছে দেখছ না ?"

—"অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি, কি হয়েছে তাতে ? গরুদের কোনো অপকার করছে নাকি ?"

"নিশ্চয়ই! এই দুপুর রোদে ঘুরলে বেচারাদের মাথা ধর্‌বে না? না, গরু বলে' মাথাই নয় ওদের! মানুষ নয় ওরা? বাড়ী নিয়ে যাক্, বলে' আসি রাখালটাকে। সকাল-বিকালে এক-আধটু হাওয়া খাওয়ালে কি হয় না? সেই হোলো গে বেড়ানোর সময়—এই কাটফাটা রোদ্দুরে এখন এ কি?"

কিন্তু রাখাল বাড়ী ফিরতে রাজি হয় না—গরুদের অপকার করতে সে বদ্ধপরিকর।

নিরঞ্জন হতাশ হয়ে ফিরে' হা-হুতাশ করে—"দেখ্‌ছ হিরণ্যাক্ষ, ব্যাটা নিজেও হয়ত মারা যাবে এই গরমে, কিন্তু দুনিয়ার লোকগুলোই এই রকম! পরের অপকারের সুযোগ পেলে আর কিছু চায় না, পরের অপকারের জন্য নিজের প্রাণ দিতেও প্রস্তুত!"

যখন শুন্‌লাম সেই নিরঞ্জন বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে' শ্বশুরের টাকায় ব্যারিষ্টারী পড়্‌তে বিলেত যাচ্ছে, তখন আমি রীতিমত অবাক হয়ে গেলাম। যাক্, এতদিনে তাহ'লে ও নিজেকে পর বিবেচনা করতে পেরেচে, তা না হ'লে নিজেকে ব্যারিষ্টারী পড়্‌তে বিলেত পাঠাচ্ছে কি করে'? নিজেকে পর না ভাব্‌তে পারলে নিজের প্রতি এতখানি পরোপকার করা কি নিরঞ্জনের পক্ষে সম্ভব?

অকস্মাৎ একদিন নিরঞ্জন আমার বাড়ী এসে হাজির।

বোধ হয় বিলেত যাবার আগে বন্ধুদের কাছে বিদায় নিতেই বেরিয়েছিল। অভিমানভরে বল্লুম—"চুপি-চাপি বিয়েটা সারলে হে, একবার খবরও দিলে না বন্ধুদের? জানি, আমাদের ভালোর জন্যই খবর দাওনি, অনেক কিছু ভালোমন্দ খেয়ে পাছে কলেরা ধরে, সেই কারণেই কাউকে জানাওনি,—কিন্তু না হয় নাই খেতাম আমরা, কেবল বিয়েটাই দেখ্‌তাম। বউ দেখ্‌লে কাণা হয়ে যেতাম না ত!"

—"কি যে বলো তুমি! বিয়েই হোলো না ত বিয়ের নেমন্তন্ন! নিজের উপকার করব তুমি তাই ভেবেছ আমাকে? পাগল! ভাব্‌ছি তোত্‌লাদের জন্য একটা ইস্কুল খুল্‌ব। মূক-বধিরদের বিদ্যালয় আছে, কিন্তু তোত্‌লাদের নেই। অথচ কি 'পসিবিলিটি'ই না আছে তোত্‌লাদের!"

—"কি রকম?"—আমি অবাক হবার চেষ্টা করি।

—"জানো? প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস্ আসলে কি ছিলেন? একজন তোত্‌লা মাত্র। মুখে মার্ব্বেলের গুলি রাখার প্র্যাক্‌টিশ্ করে' করে' তোত্‌লামি সারিয়ে ফেল্লেন। অবশেষে, এত বড় বক্তা হলেন যে অমন বক্তা পৃথিবীতে আর কখনো হয়নি। সেটা মার্ব্বেলের গুলির কল্যাণে কিম্বা তোত্‌লা ছিলেন বলেই হোলো, তা অবশ্য বল্‌তে পারি না।"

—"বোধ হয় ওই দুটোর জন্যই"—আমি যোগ দিলাম।

নিরঞ্জন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠ্ল—"আমারো তাই মনে হয়। আমিও স্থির করেছি বাংলাদেশের তোত্‌লাদের সব ডিমস্থিনিস্ তৈরি করব। তোত্‌লা তো তারা আছেই, এখন দরকার শুধু মার্বেলের গুলির। তাহলেই ডিমস্থিনিস্ হবার আর বাকী কি রইলো ?"

আমি সভয়ে বল্লাম—"কিন্তু ডিমস্থিনিসের কি খুব প্রয়োজন আছে এদেশে ?

সে যেন জ্বলে' উঠ্ল—"নেই আবার! বক্তার অভাবেই দেশের এত দুর্গতি, লোককে কাজে প্রেরণা দিতে বক্তা চাই আগে। শত সহস্র বক্তা চাই, তা না হ'লে এই ঘুমন্ত দেশ আর জাগে না। কেন, বক্তৃতা ভালো লাগে না তোমার ?"

—"থাম্লে ভারি ভালো লেগে যায় হঠাৎ, কিন্তু যখন চল্‌তে থাকে তখন মনে হয় কালারাই পৃথিবীতে সুখী।"

আমার কথায় কান না দিয়ে নিরঞ্জন বলে' চল্‌ল—"তাহ'লেই দেখো, দেশের জন্য চাই বক্তা, আর বক্তার জন্য চাই তোত্‌লা। কেননা ডিমস্থিনিসের মতো বক্তা কেবল তোত্‌লাদের পক্ষেই হওয়া সম্ভব, যেহেতু ডিমস্থিনিস্ নিজে তোত্‌লা ছিলেন। অতএব ভেবে ছাখো, তোত্‌লারাই হোলো আমাদের ভাবী আশাভরসা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ।"

যেমন করে' ও আমার আস্তিন্ চেপে ধরল, তাতে বাধ্য হয়ে জামা বাঁচাতে আমাকে সায় দিতে হোলো।

—"তোত্লাদের একটা ইস্কুল খুল্ব, সবই ঠিক, বিস্তর তোত্লাকে রাজিও করেছি, কেবল একটা পছন্দসই নামের অভাবে ইস্কুলটা খুল্তে পারছি না। একটা নামকরণ করে' দাও না তুমি। সেইজন্যই এলাম।"

—"কেন, নামতো পড়েই আছে, 'নিস্বভারতী',—চমৎকার! ভারতী মানে বাক্য, যাদের নিস্ব, কিনা থেকেও নেই, তারাই হোলো গিয়ে নিস্বভারতী।"

—"উঁহু, ও নাম দেওয়া চল্বে না। কারণ রবিঠাকুর ভাববেন 'বিশ্বভারতী' থেকেই নামটা চুরি করেচি।"

—"তবে একটা ইংরিজি নাম দাও—Sanatorium for faltering Tongues (সানাটোরিয়াম্ ফর্ ফল্টারিং টাংস্)—বেশ হবে।"

—"কিন্তু বড় লম্বা হোলো যে।"

"তাত' হোলোই। যেদিন দেখ্বে, তোমার ছাত্ররা তাদের ইস্কুলের পুরো নামটা সটান্ উচ্চারণ করতে পারছে, কোথাও আট্কাচ্ছে না, সেদিনই বুঝবে তারা পাশ হয়ে গেছে। তখন তারা সেলাম্ ঠুকে বিদায় নিতে পারে। নামকে-নাম, কোশ্চেন্ পেপার্কে কোশ্চেন্ পেপার্।"

—"হাঁ, ঠিক বলেছ। এই নামটাই থাকুল।"—বলে' নিরঞ্জন আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে' সবেগে বেরিয়ে পড়ল, সম্ভবত সেই মুহূর্তেই তার ইস্কুল খোলার সুমংলবে।

মহাসমারোহে এবং মহা সোরগোল করে' নিরঞ্জনের ইস্কুল চল্‌ছে। অনেকদিন এবং অনেকধার থেকেই খবরটা কানে আস্‌ছিল। মাঝে মাঝে অদম্য ইচ্ছাও হোতো একেবার দেখে আসি ওর ইস্কুলটা, কিন্তু সময় পাচ্ছিলাম না মোটেই। অবশেষে গত গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিটা সাম্‌নে পেতেই ভাব্‌লাম—নাঃ, এবার দেখ্‌তেই হবে ওর ইস্কুলটা। এ সুযোগ আর হাতছাড়া নয়। নিরঞ্জন ওদিকে দেশের এবং দশের উপকার করে' মরছে, আর আমি ওর কাছে গিয়ে ওকে একটু উৎসাহ দেব, এইটুকু সময়ও হবে না আমার! ধিক্ আমাকে!

মার্বেলের গুলির কল্যাণে, নিশ্চয়ই অনেকের তোত্‌লামি সেরেছে এতদিন। তাছাড়া আনুসঙ্গিক ভাবে আরো অনেক উপকার—যেমন দাঁত শক্ত, মুখের হাঁ বড়, ক্ষুধাবৃদ্ধি—এসবও হয়েছে। এবং ডিমস্থিনিস হবার পথেও অনেকটা এগিয়েছে ছাত্ররা।—অন্ততঃ 'ডিম' পর্য্যন্ত তো এগিয়েছেই, এবং যেরকম কসে' তা দিচ্ছে নিরঞ্জন, তাতে 'স্থিনিসেরও' বেশি দেরি নেই—হয়ে এল বলে'।

ঠিকানার কাছাকাছি পৌঁছতেই বিপর্য্যয় রকমের কলরব

কানে এসে আঘাত করল, সেই কোলাহল অনুসরণ করে সানাটোরিয়াম্ ফর্ ফলটারিং টাংস্ খুঁজে বের করা কঠিন হোলো না। বিচিত্র স্বরসাধনার দ্বারা ইস্কুলটা প্রতিমুহূর্ত্তেই যেন প্রমাণ করতে উদ্যত যে, ওটা মূকবধিরদের বিদ্যালয় নয়—কিন্তু আমার মনে হোলো, তাই হলেই ভালো ছিল বরং,—ওদের কষ্ট-লাঘব এবং আমাদের কানের আত্মরক্ষার পক্ষে।

আমাকে দেখেই কয়েকটি ছেলে ছুটে এল—“কা-কা-কা-কা-কা-কে চান ?”

দ্বিতীয়টি তাকে বাধা দিয়ে বল্‌তে গেল—“মা-মা-মা-মা-মা—” কিন্তু মা-মার বেশি আর কিছুই তার মুখ দিয়ে বেরুল না।

তখন প্রথম ছাত্রটি দ্বিতীয়ের বাক্যকে সম্পূর্ণ করল-“মাষ্টর্ বা-বা-বা-বা—” আমি বল্লাম “কাকাকে, মামাকে কি বাবাকে কাউকে আমি চাই না! নিরঞ্জন আছে ?”

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগ্‌ল ? সে কি, নিরঞ্জনকে এরা চেনে না ? এদের প্রতিষ্ঠাতা নিরঞ্জন, তাকেই চেনে না! কিম্বা যার নাম উচ্চারণ-সীমার বাইরে, তাকে না চেনাই এরা নিরাপদ মনে করেছে।

একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন ঐখান দিয়ে, মনে হোলো এই ইস্কুলেরই ক্লার্ক্, তাঁকে ডেকে নিরঞ্জনের খবর জিজ্ঞাসা করতে তিনি বল্লেন—“ও, মাষ্টার বাবু ?” এই পর্য্যন্ত

আমাকে দেখেই কয়েকটি ছেলে ছুটে এল—"কা-কা-কা-কা-কা-কে চান ?"

তিনি বল্লেন, বাকিটা হাতের ইসারা দিয়ে জানালেন যে তিনি উপরে আছেন। এই ভদ্রলোকও তোত্‌লা নাকি ?

আমাকে দেখেই নিরঞ্জন চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল—"এই যে অ-অনেক দিন পরে! খ-খবর ভালো?"

য়্যাঁ? নিরঞ্জনও তোত্‌লা হয়ে গেল্‌ নাকি? না, ঠাট্টা করছে আমার সঙ্গে? বল্লাম—"তা মন্দ কি! কিন্তু তোমার খবর তো ভালো মনে হচ্ছে না? তোত্‌লামি প্র্যাক্‌টিস্‌ করছ কবে থেকে?"

—"পা-পা-পরাক্—প্রাস্‌টিক্‌ করব কে-কেন? তো-তো-তোত্‌লামি আবার কে-কেউ প্রাক্‌টিস্‌ করে!"

—"তবে তোত্‌লামিতে প্রোমোশন পেয়েছ বলো!"

"ভাই হি-হি-হিরন্না-ন্না-ন্না-ন্না-ন্না-ন্না" বল্‌তে বল্‌তে নিরঞ্জনের দম আট্‌কে যাবার যোগাড় হোলো। আমি তাড়াতাড়ি বল্লাম—"হিরণ্যাক্ষ বল্‌তে যদি তোমার কষ্ট হয়, না হয় তুমি আমাকে হিরণ্যকশিপুই বোলো। 'কশিপু'র মধ্যে 'দ্বিতীয় ভাগ' নেই।"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নিরঞ্জন বল্‌ল—"ভাই হি-হিরণ্য-কশিপু, আমার এই সানাটো-টো-টো-টো-টো"—

এবার ওর চোখ কপালে উঠ্‌ল দেখে আমি ভয় খেয়ে গেলাম। ইস্কুলের লম্বা নামটা সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার অভিপ্রায়ে বল্লাম—"হ্যাঁ, বুঝেছি, তোমার এই সানাটোজেন, তারপর?"

নিরঞ্জন রীতিমত চটে গেল—"সানাটোজেন? আমার ইস্কুল হো-হো-হোলো গিয়ে সা-সানাটোজেন? সানাটোজেন তো এ-একটা ও-ও-ওষুধ!"

—"আহা ধরেই নাও না কেন! তোমার ইস্কুলও তো একটা ওষুধ বিশেষ! তোত্‌লামি সারানোর এটা ওষুধ নয় কি?"

অতঃপর নিরঞ্জন খুসি হয়ে একটু হাস্‌ল। ভরসা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"তা, তোমার ছাত্ররা কদ্দূর ডিমস্থিনিস্ হোলো?"

—"ডি-ডিম হোলো!"

—"অদ্ধেক যখন হয়েছে, তখন পুরো হতে আর বাকি কি!" আমি ওকে উৎসাহ দিলাম।

নিরঞ্জন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়ে—"আ-আর হবে না! মা-মা-মার্বেল্‌ই মুখে রাখ্‌তে পা-পারে না তো কি-কি-কি-করে' হবে?"

—"মুখে রাখ্‌তে পারে না? কেন?"

—"স-স-সব গি-গিলে ফেলে!"

—"গিলে ফেলে? তাহলে আর তোত্‌লামি সারবে কি করে, সত্যিই ত! তা, তুমি নিজেরটা সারিয়ে ফেল, বুঝ্‌লে? রোগের গোড়াতেই চিকিৎসা হওয়া দরকার, দেরি করা ভালো না।"

হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে নিরঞ্জন জবাব দেয়—"আ-আমার ডি-ডি-ডি-ডিস্‌পেপ্‌সিয়া আছে? হ-হ-হজম্ কোর্‌তে পা-পারবো কেন?"

—"ও, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া থাক্‌লে তোত্‌লামি সারে না বুঝি ?"

—"তা-তা কেন ? আ-আমিও গি-গিলে ফেলি !"—আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম, নিরঞ্জন বল্‌ল, "আ-আমার কি আর পা-পা-পাথর হ-হজম্ করার ব-ব-বয়স আছে ?"

—"তাইত ! ভারি মুস্কিল ত ! তোমার চল্‌ছে কি করে ? ছেলেরা বেতন দেয় ত নিয়ম মত ?"

—"উঁহু,—স-সব ফি-ফি-ফ্রি যে ! অ-অনেক সা-সাধাসাধি করে' আন্‌তে হয়েছে !"

—"তবে তোমার চল্‌ছে কি করে ?"

—"কে-কেন ? মা-মা-মার্বেবল্ বেচে ? এক (— দ-দ-দশটা বারোটা করে' খায় রোজ। ওগুলো মু-মু-মুখে রাখ ভা-ভা-ভা-ভারি শক্ত।"

—"বটে ?" বিস্ময়ে অনেকক্ষণ আমি হতবাক্ হ'য়ে রইলুম, তারপরে আমার মুখ দিয়ে কেবল বেরুলো—"ব-ব-বল কি !"

যেম্‌নি না নিজের কণ্ঠস্বর কানে যাওয়া, অম্‌নি আমার আত্মাপুরুষ চম্‌কে উঠল ! য়ঁ্যা, আমিও তোত্‌লা হয়ে গেলাম নাকি ! নাঃ, আর একমুহূর্ত্তও এই মারাত্মক জায়গায় না ! তিন লাফে সিঁড়ি টপ্‌কে উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়লুম সদর রাস্তায় !

শেষ